রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম. এস্-সি.

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

পাটুয়াটুলী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৫

মুদ্রাকর

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত

শ্রীনারসিংহ প্রেস

৫নং কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

কল্যাণীয় শ্রীমান গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পরমকল্যাণবরেষু

খোকা,

তোমারই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া যে পুস্তকের কল্পনা প্রথম মনে উদয় হইয়াছিল আজ তাহার পরিসমাপ্তির দিনে তাহা তোমারই হস্তে অর্পণ করিলাম। ইতি—

বাবা

মুখবন্ধ

যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে অহরহ প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, এবং যাহার সদুত্তর আমরা বাঙ্‌লা ভাষায় সহজে খুজিয়া পাই না, সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে আমার এই প্রয়াস। জানি না এ বিষয়ে কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি।

গ্রন্থকার

সূচী

জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রাকৃতিক ঘটনা

পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা

পৃষ্ঠা

শারীর-বিদ্যা

উদ্ভিদ-বিদ্যা

পৃষ্ঠা

ভূবিদ্যা

রামধনু

জানা কি ?

বিদ্যুৎ চম্‌কানো ও মেঘগর্জ্জন এক সঙ্গেই দেখা ও শোনা যায় না কেন ?

বিদ্যুৎ চম্‌কাইলেই আমরা কানে হাত দেই যাহাতে মেঘগর্জ্জনে আমাদের কানে তালা না লাগে। মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চম্‌কানো দুইখানি মেঘের সংঘর্ষণে একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়। তবে একটা দেখার খানিকক্ষণ পরে আর একটা শোনা যায় কেন ?

আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে গমন করে, আর শব্দ সেকেণ্ডে ১,১০০ এক হাজার একশত ফুট বেগে গমন করে। সুতরাং যে দূরত্ব অতিক্রম

করিতে আলোর লাগে মাত্র এক সেকেণ্ড, সেই দূরত্ব অতিক্রম করিতে শব্দের লাগিবে ৮,৯২,৮০০ আট লক্ষ বিরানব্বুই হাজার আট[illegible] সেকেণ্ড, অর্থাৎ ২৪৮ [illegible] এখন বুঝা গেল বিদ্যুতের আলো দেখার কিছুক্ষণ বাদে কেন মেঘের গর্জ্জন শোনা যায়

আকাশের রং [illegible]মানী কেন ?

সূর্য্যরশ্মি আমাদের চোখে প্রতিভাত হয় ; কিন্তু যখন এই সাদা সূর্য্যরশ্মি একটি ত্রিকোণ কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া দেখা যায়, তখন সাদা রশ্মির স্থানে আমরা রামধনুর সাতটি বর্ণ দেখিতে পাই, যথা—লাল, বাদামি, পীত, হরিৎ, আশ্‌মানী, নীল এবং বেগুনি, অর্থাৎ এই সাতটি রঙ্গিন রশ্মির সমবায়ে সূর্য্যের শ্বেতরশ্মি গঠিত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একথা জানিতেন বলিয়াই সূর্য্যের আর একটি নাম দিয়াছিলেন 'সপ্তাশ্ব-বাহন'।

আমরা গাছের পাতা সবুজ দেখি কেন ? সূর্য্যের কিরণ যখন সবুজ পাতার উপর পতিত হয়, তখন পাতার সবুজ বর্ণ সূর্য্যরশ্মির অপর ছয়টি বর্ণ শোষণ করিয়া কেবল মাত্র সবুজ রশ্মিই প্রতিফলিত করে। সেই প্রতিফলিত সবুজ রশ্মি আমাদের চোখে পৌঁছিলেই আমরা পাতার বর্ণ সবুজ দেখি। আকাশে বাতাসে কোটি কোটি ধূলিকণিকা ভাসিয়া বেড়ায়, সূর্য্যরশ্মি যখন ইহাদের উপর পতিত হয় তখন ইহারা অন্যান্য

বর্ণ শোষণ করিয়া কেবল আশ্‌মানী রঙকেই প্রতিফলিত করে। এইরূপে ধূলিকণিকা হইতে প্রতিফলিত আশ্‌মানী রশ্মি আমাদের চোখে পৌঁছিয়া সমস্ত আকাশকে আশ্‌মানী করিয়া তোলে।

শীতকালে কুয়াসা হয় কেন ?

আমরা জলের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই,—জলীয় বাষ্প, জল এবং বরফ। জলের তাপ যখন ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়, জল তখন বাষ্পাকার প্রাপ্ত হয়। ১০০° ডিগ্রির নীচ হইতে ০ শূন্য ডিগ্রি পর্য্যন্ত জল তরল অবস্থায় থাকে, তাহার নীচে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়।

গ্রীষ্মকালে বাতাসের তাপ যখন বেশী থাকে তখন হাই তুলিলে মুখ হইতে যে বাতাস বাহির হয়, তাহাতে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শীতকালে যখন বাতাসের তাপ অনেক নীচে নামিয়া যায়, তখন ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া সেই জলীয় বাষ্প জমিয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে আমরা সাদা ধোঁয়ার মত দেখিতে পাই। ভাত রান্না করিবার সময় কিংবা জল ফুটাইবার সময়, এই কারণেই আমরা বাষ্পাকারে জলীয় বিন্দু দেখিতে পাই। ইহাই আরও ঠাণ্ডা হইলে একত্রিত হইয়া বড় বড় জলবিন্দুতে পরিণত হয়। কেট্‌লির জল যখন ফুটিতে থাকে তখন তাহার উপর

একখণ্ড কাচ ধরিলেই তাহার উপর বাষ্পের জলে পরিণত হওয়া দেখা যাইবে।

শীতের ঠাণ্ডা রাত্রে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধূম ও ঠাণ্ডা ধূলিকণার সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া কুয়াসার সৃষ্টি করে। বড় বড় নদী, সমুদ্র প্রভৃতির উপর সত্যিকার কুয়াসা দেখা যায়। সূর্য্যের তাপ প্রখর হইলেই কুয়াসা অন্তর্হিত হয়।

শিশির জমে কেন ?

'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির', অথচ দিনের বেলায় শিশির দেখা যায় না। বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। এই সীমা আবার বাতাসের তাপের উপর নির্ভর করে। বাতাস যদি বেশী গরম হয় তবে সে বেশী এবং কম গরম হইলে কম বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে। এই মাত্রার সীমা অতিক্রম করিলেই অতিরিক্ত বাষ্প জলবিন্দুরূপে ঠাণ্ডা জিনিসের উপর সঞ্চিত হইয়া শিশিরে পরিণত হয়।

রাত্রে সূর্য্যের তাপ যখন থাকে না, পৃথিবী তখন অতি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। সুতরাং পৃথিবী বাতাস হইতে তাপ গ্রহণ করিতে থাকে, ইহার ফলে রাত্রি যত বেশী হইতে থাকে বাতাসও ততই ঠাণ্ডা হয়। এ প্রকারে বাতাসের তাপ এত

কমিয়া যায় যে, উহার জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার সীমাও কমিয়া আসে। ইহাতে বাতাসের অতিরিক্ত বাষ্প জলবিন্দু-রূপে ঠাণ্ডা পাতা কিংবা ঘাসের উপর জমিয়া শিশিরে পরিণত হয়। তাই আমরা সকালে উঠিয়া গাছের পাতা হইতে শিশির পড়িতে দেখি।

থার্মোস-ফ্লাস্কে গরম জল গরম এবং ঠাণ্ডা জল ঠাণ্ডাই বা থাকে কেন ?

আজকাল থার্মোস-ফ্লাস্ক একটা নিত্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও যাইতে হইবে—সঙ্গে থার্মোস-ফ্লাস্কে চা, দুধ লইয়া চল ; গ্রীষ্মের দিনে ঠাণ্ডা জল কিংবা বরফ লইয়া চল। কিন্তু থার্মোস-ফ্লাস্কে রাখিলে গরম চা বা দুধ ঠাণ্ডা হয় না কেন, আবার ঠাণ্ডা জল গরম হয় না, কিংবা বরফও গলে না কেন ?

থার্মোস-ফ্লাস্কের আসল পাত্রটি কাচ-নির্ম্মিত। পাত্রের গায়ে দুইটি স্তর এবং স্তর দুইটির মাঝখান হইতে বাতাস বাহির

করিয়া বায়ুশূন্য করা হয়। তাপ শূন্যের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ভিতরের জিনিসের তাপ বা ঠাণ্ডা ও বাহিরের বাতাসের ঠাণ্ডা বা তাপের মধ্যে আদান প্রদান হইতে পারে না; কাজেই থার্মোস-ফ্লাস্কের মধ্যস্থিত জিনিসের তাপের বা ঠাণ্ডার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই কার্য্যের সাহায্যার্থে কাচপাত্রটি আয়নার তুল্য চক্‌চকে সাদা করা যায়।

তারা সত্যই কি খসিয়া পড়ে ?

পরিষ্কার রাত্রে দেখা যায়—হঠাৎ একটা নক্ষত্র আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। চল্‌তি কথায় উহাকে আমরা 'তারা-খসা' বলি। সত্যই কি তারা খসিয়া পড়ে ?

উহারা আদৌ তারা নয়। পৃথিবী অপেক্ষা আয়তনে হাজার হাজার গুণ বড় তারার একটি যদি খসিয়া পৃথিবীর বুকে পড়িত, তাহা হইলে পৃথিবীর দশা কি হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমরা জ্বলন্ত যে পদার্থটি দেখি, উহা একটি উল্কাপিণ্ড। তাহার দেহ লৌহ, নিকেল প্রভৃতি ধাতুদ্বারা গঠিত। উহারা সংখ্যায় অগণিত এবং প্রচণ্ড-বেগে আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন উহাদের কেহ পৃথিবীর টানের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর দিকে প্রচণ্ড

উনানে আগুন দিলে দেখা যায় ধূম উপরের দিকে উঠিতেছে ; সহরে, বড় বড় কারখানায় চিম্‌নি দিয়া ধূম উপরে যাইতেছে দেখা যায়। উহার কারণ—উনানের উপরের বায়ু অগ্নি সংযোগে উত্তপ্ত হয়, তাহাতে উহার আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় আপেক্ষিক ঘনত্ব কমিয়া গিয়া বায়ু হাল্‌কা হয়, তাই সেই উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠিয়া যায়।

সহজে তোমরা এই পরীক্ষাটি করিতে পার। সকলের বাড়ীতেই ল্যাম্প থাকে। একটি ল্যাম্প জ্বালিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর চিম্‌নির মুখে হাত দিয়া দেখ গরম বাতাস উপরে উঠিতেছে। কয়েক টুকরা ছোট ছোট কাগজ চিম্‌নির উপর ছাড়িয়া দেও, দেখিবে টুকরাগুলি বাতাসের সহিত উপরে উঠিতেছে। প্রমাণ হইল চিম্‌নির ভিতরের বাতাস তাপে গরম হইয়া হাল্‌কা হইলে উপরে উঠে। চিম্‌নির ভিতর শূন্য স্থান দখল করিবার জন্য বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, সেই জন্যই ল্যাম্পের যেখানে চিম্‌নি বসে সেখানে বহু ছিদ্র থাকে। ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিও আলো ক্রমশঃ নিবিয়া যাইবে। কেন বল তো ?

এখন আমরা বলিতে পারিব ঝড় উঠে কেন। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ধরাপৃষ্ঠে কোন স্থানের বায়ু বেশী উত্তপ্ত হইলে সেই বায়ু হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠে। তখন তাহার

জান কি ?

পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে ঠাণ্ডা বায়ু ছুটিয়া আসিয়া সেই স্থান দখল করিবার সময় ঝড়ের সৃষ্টি করে।

ব্যারোমিটার কি ?

ঝড়ের প্রসঙ্গে ব্যারোমিটারের কথা তোমাদের জানা উচিত। তোমরা—যাহারা খবরের কাগজ পড় তাহারা, অবশ্যই দেখিয়া থাকিবে আবহাওয়া সম্বন্ধে প্রত্যহ কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া থাকে—যাহাকে 'Weather forecast' বলে। এজন্য সরকারের **'হাওয়া আফিস'** আছে। কলিকাতায় যাহারা বাস কর তাহারা বোধ হয় জান, নদীতে জাহাজ নৌকা প্রভৃতির নিরাপদের জন্য পোর্ট কমিশনার কখনও কখনও Danger Signal (বিপদ্-জ্ঞাপক সঙ্কেত) দিয়া থাকেন। উহার অর্থ—ঝড় উঠিতেছে, তোমরা সাবধান হও। তাহা হইলে ঝড় উঠিবার কথা পূর্ব্বাহ্নেই জানা যায়। যে যন্ত্রের সাহায্যে উহা জানা যায়, তাহার নাম **ব্যারোমিটার।**
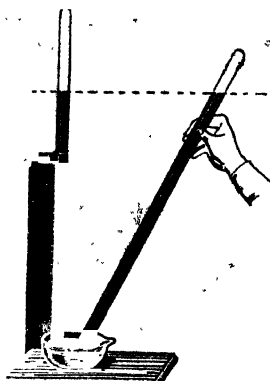
ব্যারোমিটার

একটি ৩৪ কি ৩৫ ইঞ্চি লম্বা কাচের নল লইয়া তাহাকে

পারদ দ্বারা সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করা হইল। একটি কাচপাত্রে খানিকটা পারদ লইয়া তাহার ভিতর পারদপূর্ণ নলটি উল্টাইয়া ধরা হইল। দেখা গেল পারদস্তম্ভ নামিয়া প্রায় ২৯½″ ইঞ্চিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহাই হইল বায়ুচাপের মাপ; অর্থাৎ বায়ু যখন স্থিরভাবে থাকে তখন উহার চাপ, শূন্যস্থানে পারদস্তম্ভকে ২৯½″ ইঞ্চি ঠেলিয়া উঠায়।

বায়ু উত্তপ্ত হইয়া যখন হাল্‌কা হয় তখন উহার চাপ কমিয়া যায়, ফলে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ নামিয়া যায়। কাজেই যখন আমরা দেখি ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ নামিয়া যাইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে ঝড় প্রায় আসন্ন।

সমুদ্রের জল লোনা কেন?

নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবার জল মিঠা, আর সমুদ্রের জল লোনা, অথচ এই নদ-নদীই আবহমান কাল ধরিয়া অনবরত বরফগলা কিংবা বৃষ্টির মিষ্টি জল বহন করিয়া সমুদ্রে ঢালিতেছে। তবে এই দুই জলে স্বাদের এমন পার্থক্য কেন? পৃথিবীর চারিভাগের তিনভাগ সমুদ্র; কিন্তু এই সমুদ্রের উপর দিয়া যখন জাহাজ পাড়ি জমায়, তখন তাহাকে জাহাজ বোঝাই করিয়া মিঠা জল লইতে হয়, ইহা যে সত্যই Carrying coal to New Castle !

জান কি ?

পৃথিবীর উপর যখন বৃষ্টি পতিত হয়, তখন তাহার কতক অংশ মাটির নীচে চলিয়া গিয়া পুনরায় ঝরণারূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়, বাকী অংশ পৃথিবীর বুকে—

পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা—

উচ্চ প্রদেশ হইতে নিম্ন প্রদেশে তটিনী হইয়া বহিয়া যায়; অবশেষে তাহার

উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া—

সে প্রাণ মিশায় আর সে গান শেষ করে।

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখ, সমস্ত নদ-নদীই পাহাড়-পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ ঢালু প্রদেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে।

পৃথিবীর মাটিতে অল্পবিস্তর লবণ সর্ব্বত্র মিশিয়া আছে। বৃষ্টির কিংবা পাহাড়ের উপর হইতে বরফগলা জল যখন মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া চলে, সেই সময় মাটির সহিত মিশ্রিত লবণ সে জলে গুলিয়া যায়। কিন্তু সেই জলে লবণের অনুপাত এত কম যে, জিহ্বায় তাহার স্বাদ পাওয়া যায় না, তাই নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবার জলকে আমরা মিঠা জল বলি।

নদীর জল ঐ লবণ বহন করিয়া নিয়া সমুদ্রে ঢালিয়া দিতেছে। এদিকে সমুদ্রের জল সর্ব্বদা বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিতেছে। সমুদ্রের জল যখন বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন তাহার লবণ জলে পড়িয়া থাকে ; কারণ জলীয় বাষ্পের সহিত জল ভিন্ন আর কিছুই যাইতে পারে না। এক সের আন্দাজ জল লইয়া তাহাতে একটু লবণ গুলিয়া চাখিয়া দেখিও লবণের স্বাদ পাইবে না। কিন্তু একটা পাত্রে রাখিয়া সেই লবণগোলা জল ফুটাইতে আরম্ভ কর, দেখিবে জল যখন কমিয়া এক পোয়া হইয়াছে তখন জলের স্বাদ লোনা লাগিবে। জল যত কমিয়া যাইবে তত বেশী লবণাক্ত বোধ হইবে।

সমুদ্র হইতে রাত-দিন জল বাষ্পাকারে উঠিয়া যাইতেছে। এই জলীয় বাষ্পই পরে মেঘে পরিণত হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হয়। বৃষ্টির জল আবার মাটির লবণ বহিয়া লইয়া সমুদ্রে ঢালিয়া দেয়। এইরূপে সমুদ্রের জলে লবণ রাখিয়া উত্থিত জলীয় বাষ্প মেঘের আকার ধারণ করে, সেই মেঘ পরে বৃষ্টিরূপে মাটির উপর পতিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে এবং সমুদ্রের জলভাগ সমান রাখিতেছে।

এইরূপে কোটি কোটি যুগ ধরিয়া নদ-নদী পৃথিবীর বুক হইতে জলে গুলিয়া লবণ আনিয়া সমুদ্রে জমা করিয়াছে

ও করিতেছে। আর তাহারই ফলে সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে লোনা হইতেছে। সমুদ্রের সেই লোনা জলই নানা উপায়ে বাষ্পে পরিণত করিয়া আমাদের খাবার লবণ তৈয়ার করা হয়।

বৃষ্টি হয় কেন?

মানুষের জীবনে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা বলিয়া দিতে হয় না। চাষী জমি চাষ করিয়া বসিয়া আছে—কখন বৃষ্টি হইবে সে ফসল বুনিবে। সময় মত বৃষ্টি আর হইল না, ফলে দুর্ভিক্ষ ঘটিল। গরমের দিনে অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হইয়া, এক পস্‌লা বৃষ্টির জন্য কতই না কামনা করি! দিনের কাঠফাটা রৌদ্রের পর আকাশের কোণে একখানা কাল মেঘ কত আনন্দই না আনয়ন করে! সারা বছর ধরিয়া তো বৃষ্টি হয় না! আর গ্রীষ্মের সময়ই বা বৃষ্টি হয় কেন?

বাতাসে সব সময়েই কম-বেশী জলীয় বাষ্প আছে। সেজন্যই গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর আবির্ভাব ও পরিবর্ত্তন হয়। বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার তাপের উপর নির্ভর করে। গরম বাতাস বেশী এবং ঠাণ্ডা বাতাস কম জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে। শীতকালে বাতাসে জলীয় ভাগ কম থাকায়, অনেক সময় আমাদের হাত-পা, ঠোঁট, গাল ফাটিয়া যায়।

মেঘ

গরম বাতাস তাহার জলীয় বাষ্প লইয়া যখন আকাশের ঠাণ্ডা প্রদেশে প্রবেশ করে, তখন তাহার জলীয় বাষ্প হইতে তাপ বিকীর্ণ হওয়ায় ঠাণ্ডা হইয়া জলীয় বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয়। কেট্‌লির নলের মুখে একখানি শীতল কাচখণ্ড ধরিলে দেখা যাইবে, কেট্‌লির ভিতরস্থ ফুটন্ত জল হইতে যে জলীয় বাষ্প নল দিয়া বাহির হইবে, তাহা কাচের শীতল গাত্রের স্পর্শে আসিয়া জলবিন্দুতে পরিণত হইবে।

গরম বাতাসের সহিত আকাশে উঠিয়া জলীয় বাষ্প জল-কণিকায় পরিণত হয়। কোটি কোটি জল-কণিকা মিলিয়া মেঘের আকার ধারণ করে। ক্রমে এই জল-কণিকাগুলি একত্র হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দুতে পরিণত হয়। জলবিন্দুগুলি ভারী হইলে বাতাস আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সেই অবস্থায় তাহারা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হয়। বেশী ঠাণ্ডা পাইলে সময় সময় জলবিন্দু জমিয়া শিলা কিংবা তুষারে রূপান্তরিত হইয়া শিলাবৃষ্টির সৃষ্টি করে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন—জলীয় বাষ্পের জলবিন্দুতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়—বাতাসে ধূলিকণা থাকার জন্য। তাঁহারা আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উহা বিদ্যুতের একটি খেলা মাত্র। তাই উড়ো জাহাজ বোঝাই করিয়া তড়িতান্বিত (electrified) বালি মেঘের মধ্যে ছড়াইয়া

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সেই চেষ্টা সফল হইবে।

সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ও সমুদ্রের জল প্রতপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে; আবার এই সূর্য্যের তাপেই পৃথিবীও উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া বাতাস গরম হওয়ায় হাল্‌কা হয়। হাল্‌কা বাতাস জলীয় বাষ্প বহন করিয়া যতই উপরে উঠিবে ততই ঠাণ্ডা হইবে। যাহারা পর্ব্বতশিখরে উঠিয়াছে, কিংবা দার্জ্জিলিং গিয়াছে তাহারা জানে শিলিগুড়ি ছাড়িয়া ট্রেন যতই উপরে উঠে ততই ঠাণ্ডা বোধ হয়। জলীয় বাষ্পও উপরে উঠিয়া ক্রমে ঠাণ্ডা হইলেই উহা জল-কণিকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে, আরও বেশী ঠাণ্ডা হইলে জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া বৃষ্টি হয়। এখন বল তো গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই কেন বেশী বৃষ্টি হয় ?

বিদ্যুৎ চমকায় কেন ?

বিদ্যুতের সঙ্গে পরিচয় আমাদের অনেক রকমে। বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রামগাড়ী দৌড়াইতেছে, রাস্তা-ঘাট বাড়ী-ঘর আলোকিত হইতেছে, কলকারখানা চলিতেছে, একস্থান হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্যস্থানে সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে, গ্রীষ্মে গরমে শরীর শীতল করিতে হাতপাখার আর দরকার

হয় না, সুইচ্ টিপিলেই বন্‌বন্ করিয়া পাখা ঘুরিয়া বাতাসের সৃষ্টি করে, আবার কলিকাতায় বসিয়া বিলাতের সঙ্গে কথা বলার অসম্ভব কল্পনাকে সম্ভব করিয়াছে বিদ্যুৎ। আজকাল বড় বড় ডাইনামো চালাইয়া এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু আকাশে মেঘের মধ্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং তাহারই প্রকাশ যে বিদ্যুৎ চম্‌কানোতে—তাহা প্রথম প্রমাণ করেন বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্ক্‌লিন। মেঘ্‌লা দিনে তামার সরু তার দিয়া ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া এই আবিষ্কার তিনি করিয়াছিলেন।

বিদ্যুৎ চম্‌কানো এবং মেঘগর্জ্জন আমরা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ই বেশী দেখিতে ও শুনিতে পাই। পৌষ-মাঘ মাসে হঠাৎ কয়েকদিন খুব গরম পড়িলে শীতকালেও বৃষ্টিপাত এবং মেঘগর্জ্জন হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে গরম মাটির সংস্পর্শে আসিয়া জলীয়-বাষ্পভরা বাতাস গরম হইয়া উর্দ্ধে উঠে। সেখানে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া জলীয় বাষ্প যখন জল-কণিকায় পরিণত হয় সেই সময় প্রত্যেকটি জল-কণিকা তড়িতান্বিত হয়। তড়িৎ-শক্তির এমনই ধর্ম্ম যে, জলপ্রবাহের মত তাহা উচ্চশক্তি হইতে নিম্নশক্তির দিকে সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়। উচ্চশক্তির দিককে পজিটিভ্ (+) এবং নিম্নশক্তির দিককে নেগেটিভ্ (−) বলে। পজিটিভ্ নেগেটিভকে টানে, কিন্তু পজিটিভ্ পজিটিভকে, কিংবা নেগেটিভ্ নেগেটিভকে দূরে ঠেলিয়া দেয়।
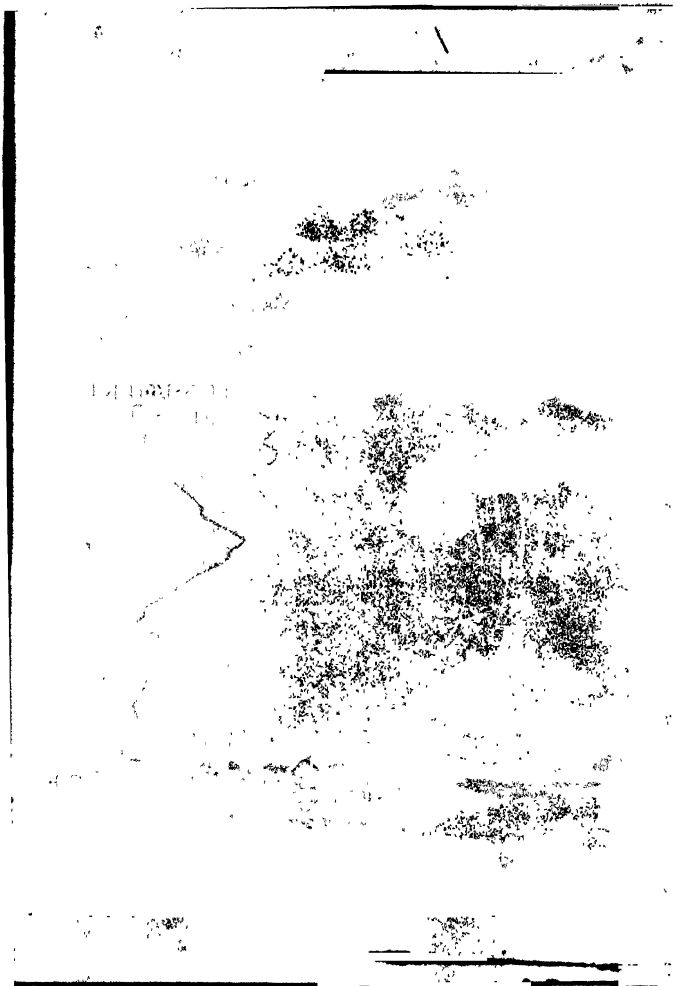
যাহাদের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাতি আছে—তাহারা দেখিয়া থাকিবে, বাতি জ্বালিবার জন্য দুইটি তার থাকে। সেই তার দুইটির প্রান্তভাগ যদি কাছাকাছি আনা যায়, তবে দেখা যাইবে —একটু দূরে থাকিতেই পজিটিভ্‌ প্রান্ত হইতে নেগেটিভ্‌ প্রান্তে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ লাফাইয়া যাইবে। অনেক সময় ট্রাম-ট্রলির মাথায় কিংবা চাকার নিকট এই তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়।

জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা পাইয়া যখন জল-কণিকায় পরিবর্তিত হইয়া মেঘ উৎপন্ন হয়, তখন সেই মেঘেরই উপর ও নীচ স্তরে, কিংবা একখণ্ড মেঘ হইতে অন্য মেঘে, কিংবা মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে নেগেটিভ্‌ ও পজেটিভ্‌ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক মেঘ দেখিলেই ঠিক পাওয়া যায়। বিরুদ্ধ বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করিয়া যখন উপর হইতে বৃষ্টির জল নীচের দিকে নামে, কিংবা জল-কণিকা বহন করিয়া মেঘ নীচ হইতে উপরের দিকে উঠে, তখন পরস্পর বিরুদ্ধ বৈদ্যুতিক শক্তি কাছাকাছি হইলেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায়। এই স্ফুলিঙ্গের আকার বৈদ্যুতিক শক্তির উপর নির্ভর করে। আমাদের বাতি, পাখা প্রভৃতি চলে যে শক্তিতে—তাহার পরিমাণ ২২০ ভোল্ট। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ স্থায়ী মেঘোৎপাদিত বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের শক্তি এক হাজার কোটি ভোল্ট! সুতরাং মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে

যখন বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখন গাছ-পালা বাড়ী-ঘর যে পুড়িয়া যাইবে কিংবা বাড়ী-ঘর ফাটিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? উহাকেই লোকে 'বাজ' পড়া বলে। বজ্রাঘাতে লোক মরার খবরও মাঝে মাঝে শুনা যায়।

মেঘ কি সত্যই গর্জ্জন করে ?

বিদ্যুৎ চম্‌কানোর সঙ্গে সঙ্গে কড়্‌কড়্‌ করিয়া ভীষণ শব্দ হইলে আমরা মনে করি 'বাজ' পড়িল। অনেক সময় তাহার বাড়ী-ঘর ফাটাইবার, গাছ-পালা পোড়াইবার এবং লোক মারিবার ক্ষমতা দেখিয়া, লোকে তাহাকে ইন্দ্রের বজ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া ঐ নাম দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহার সহিত বজ্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

যখন দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন মেঘ নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায়। সেই স্ফুলিঙ্গ এত তাপ উৎপন্ন করে যে, সেখানকার বাতাস গরমে প্রসারিত হইয়া উহার চাপ কমিয়া যায়। তাহার ফলে সেই আংশিক স্থান দখল করিতে চতুর্দ্দিক হইতে বাতাস ছুটিয়া আসিবার সময়—যে ঘর্ষণ হয়, তাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই শব্দ বায়ুতে যে শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করে, তাহা মেঘে মেঘে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া শেষ অবধি এত জোরাল হয় যে, কানে তালা লাগাইয়া দেয়।

রামধনু কি রামের ধনু ?

"উঠ্‌ছে দেখো রামধনু ওই
বল্মীকটার চূড়ায়,
রং যেন ওর রত্নপ্রভা !
দেখ্‌লে নয়ন জুড়ায়।"

বৃষ্টির অব্যবহিত পরে কিংবা বৃষ্টির মধ্যে সূর্য্য উঠিলেই তাহার বিপরীত দিকে আকাশের গায়ে রামধনু দেখা দেয়। তা' হইলে বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্যকিরণের সঙ্গে রামধনুর নিশ্চয়ই একটা সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধটা কি ?

সূর্য্যের আলোক আমরা দেখি সাদা। নিউটন দেখাইলেন সাদা সূর্য্যরশ্মি একখানি ত্রিকোণ কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিয়া যখন অন্যদিকে নির্গত হয়, তখন উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া বেগুনি (violet), মহানীল (indigo), নীল (blue), সবুজ (green), হল্‌দে (yellow), নারঙ্গ (orange) এবং লাল (red) বর্ণ রশ্মিতে পৃথক্ হইয়া যায়। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ভাঙ্গা তিনকোণা কাচের টুক্‌রা চোখের সাম্‌নে ধরিয়া এ পরীক্ষা বহুবার করিয়াছি। সুতরাং সূর্য্যের সাদা আলো প্রকৃতপক্ষে

ত্রিকোণ কাচ

সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমবায়ে উৎপন্ন। উহা প্রমাণ করিবার যশ নিউটন পাইলেও হিন্দুরা বহুপূর্ব্বে উহা জানিতেন, আর সেই জন্যই তাঁহারা সূর্য্যের নাম দিয়াছিলেন **সপ্তাশ্ব-বাহন**।

কাচের প্রিজম্ যেমন সাদা সূর্য্যরশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি উৎপাদন করে, জলবিন্দুর মধ্যেও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে তেমনই সাতটি বিভিন্ন রশ্মিতে পৃথক্ হইয়া যায় এবং তাহার প্রত্যেকটি রশ্মি জলবিন্দুর অপর পার্শ্ব হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আমাদের চোখে লাগিলে, আমরা তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি। সূর্য্যের বিপরীত দিকে বৃষ্টি হইলেই এই কারণে আমরা রামধনু দেখিতে পাই।
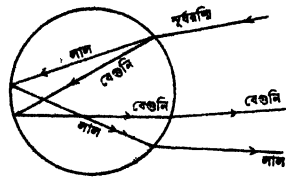
জলবিন্দু

রামধনু সকালে ও বিকালেই বেশী দেখা যায়। সকালে পশ্চিম দিকে বৃষ্টি হইলে পশ্চিমাকাশে এবং বিকালে পূর্ব্বদিকে বৃষ্টি হইলে পূর্ব্বাকাশে রামধনু দেখা দেয়। সূর্য্য আকাশের যত নীচে থাকিবে রামধনু আকাশের তত উঁচুতে দেখা যাইবে। শুধু তাহাই নহে, তুইজন লোক একই সঙ্গে একটু তফাতে দাঁড়াইয়া একই রামধনু দেখিতে পাইবে না। আকাশে রামধনু দেখা দিলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া এ কথার সত্যতা নির্ণয় করিতে পারিবে। রামধনুর কেন্দ্র, তোমার চোখ ও

সূর্য্য সর্ব্বদা সম-সূত্রে থাকিবে এবং সূর্য্য থাকিবে তোমার পিছনে, নতুবা রামধনু দেখিতে পাইবে না।

রামধনু যে রৌদ্র ও জলবিন্দুর খেলা, তাহা তোমরা সহজেই পরীক্ষা করিতে পার। একমুখ জল লইয়া সূর্য্যকে পিছন করিয়া যদি সেই জল মুখ হইতে জোরে বাহির
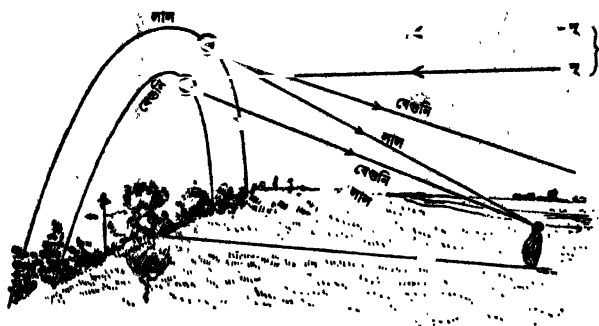
করিয়া দেও—তবে উহা অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, তখন সেই জলবিন্দুতে রামধনু দেখা যাইবে।

রাত্রে অন্ধকার আর দিনে আলো কেন ?

আমাদের একজন কবি সূর্য্যের প্রভাতে উঠা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যায় অস্ত যাওয়ার একটি অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

"প্রভাকর-প্রভা-তে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
তরুণ তপন হরে তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের হয় ভাবান্তর।
খরতর-কর-কর হ'ন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত দীন দিন-পতি॥
পরিশেষে পুনর্ব্বার ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥"

সূর্য্য কি সত্যই প্রভাতে আকাশে উঠেন এবং সন্ধ্যায় অস্ত যান ? ইহার জবাবে বৈজ্ঞানিক বলিবেন, "সূর্য্য উহার কিছুই করেন না ; চিরকাল একই স্থানে থাকিয়া তিনি কিরণ দান করিয়া আসিতেছেন ও আরও বহুকাল ধরিয়া তিনি সেই কার্য্য করিবেন।" তাহা হইলে দিন-রাত্র হয় কেমন করিয়া এবং সূর্য্যকে যে আমরা পূর্ব্বাকাশে উঠিতে আর পশ্চিমাকাশে অস্ত যাইতে দেখি তাহারই বা তাৎপর্য্য কি ?

পৃথিবীর আকৃতিকে আমরা কমলালেবুর আকৃতির সহিত তুলনা করি। কমলালেবুর মতই পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা। সুতরাং কমলালেবু

লইয়াই আমরা দিন-রাতের পরীক্ষা করিব। সূর্য্যের পরিবর্ত্তে আমরা একটি জ্বলন্ত মোমবাতি লইব।

অন্ধকার ঘরে একখানি টেবিলের উপর মোমবাতিটি বসাইয়া উহা হইতে কিছু দূরে কমলালেবুটি রাখা হইল। দেখা যাইবে কমলালেবুটির অর্দ্ধেকখানি আলোকিত হইয়াছে, বাকী অর্দ্ধেকখানি অন্ধকার। আমরা আলোকিত অর্দ্ধেকখানিতে দিন ও যে অর্দ্ধেকখানি অন্ধকার তাহাতে রাত্রি বলিতে পারি।
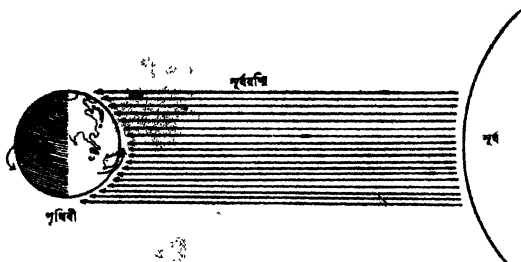
এইবার কমলালেবুটিকে তাহার অক্ষের (axis) উপর ধীরে ধীরে ঘুরাইলে দেখা যাইবে, যে দিকটা আলোকিত ছিল—সেইদিকটা ক্রমশঃ অন্ধকার এবং অন্ধকার দিকটা আলোকিত হইতেছে। উহা হইতে বুঝা যাইবে, সূর্য্য একস্থানে থাকিয়াই তাহার কিরণজাল বিস্তার করে; কিন্তু পৃথিবী তাহার অক্ষের উপর ঘুরিতেছে বলিয়া পৃথিবীতে রাতদিন হইতেছে। নিজের অক্ষের

উপর সম্পূর্ণ একবার ঘুরিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল। সুতরাং পৃথিবী বিষুবরেখার নিকট ঘণ্টায় হাজার মাইলের উপর বেগে দৌড়াইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরকার জীবজগৎ, গাছপালা, বায়ুমণ্ডলও সমানবেগে ঘুরিতেছে। কিন্তু আমরা সে ঘোরা ঠিক পাই না কেন ?

পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা এত ক্ষুদ্র যে, আমরা সে বেগ ঠিক পাই না। একটা প্রকাণ্ড মাটির জালার উপর ক্ষুদ্র একটি পিঁপড়া রাখিয়া জালাটাকে যদি প্রচণ্ড বেগে ঘুরান যায়, তবে সে বেগ পিঁপড়াটি টেরও পায় না, নিজের মত সে চারিদিকে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর তুলনায় আমরা পিঁপড়া হইতেও ক্ষুদ্র, সুতরাং পৃথিবীর ঘূর্ণন-বেগ যে আমরা জানিতে পারি না তাহাতে অশ্চর্য্য হইবার কি আছে ?

পৃথিবী কি সত্যই গোলাকার ?

ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোলাকার, কমলালেবুর মত উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা। কথাটা কি সত্যি ? আমরা চোখে সাধারণভাবে যাহা দেখি তাহাতে তো কেবল সমতল ভূমিই দেখিতে পাই !

পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু পয়সার মত গোল নহে, কমলালেবুর মতই গোল। তাহা যদি না হইত তবে চক্রবাল

চক্রাকার দেখা যাইত না। আমরা যে দিকেই তাকাই না কেন, মনে হয় আমাদের চারিদিকে যেন আকাশ ঘিরিয়া আছে। পৃথিবী সমতল হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

কোন বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ক্রমাগত একই দিকে চলিলে দেখা যাইবে জাহাজখানি আবার সেই বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং জাহাজের যে সম্মুখভাগ বন্দরকে পিছনে ফেলিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেই মুখ কখন অজানা ভাবে ঘুরিয়া বন্দরের দিকেই মুখ করিয়াছে।

পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন তাহা গোলাকার দেখা যায়। গোলাকার পদার্থ না হইলে তাহার ছায়া গোলাকার হয় না। আলোর সামনে নানা আকৃতির জিনিস ধরিয়া দেওয়ালের উপর ছায়া ফেলিয়া ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিও।

পৃথিবীর পরিধি মাপা হইয়াছে। বিষুবরেখার উপর ইহা ২৪,৯২৬ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট কিছু কম। গোলাকার জিনিস না হইলে মাপ সর্ব্বত্র এক হয় না।

তিনটি খোঁটা লইয়া সমুদ্রের কিনারা হইতে সমুদ্রের মধ্যে

সমান অথচ একটু বেশী ব্যবধানে এমন করিয়া পোঁতা হইল

যাহাতে জলের উপরের অংশ প্রত্যেকটি খোঁটার সমান থাকিবে। এখন কিনারায় দাঁড়াইয়া দূরবীন দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে মধ্যের খোঁটাটি অপর দুইটিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী গোলাকার না হইলে ইহা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর আকৃতি যে গোল ইহার পর তাহার আরও প্রমাণ চাই কি ? তাহা হইলে সমুদ্রের উপকূল হইতে জাহাজের ক্রমে অদৃশ্য হওয়া ও পাহাড়ের উপর যতই উঠা যায় ততই পৃথিবীর বুকে দিগন্ত কেন সরিয়া যায়—তাহা ভাবিয়া দেখ।

চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন ?

'হাঁসি-কান্না ল'য়ে যেন চাঁদের উদয়'। একই চাঁদ, সেই পৃথিবী, চিরন্তন সূর্য্য কাহারও পরিবর্ত্তন হইতে দেখি না, কেবল চাঁদের বেলাতেই পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া অমাবস্যা, আবার শুক্লা প্রতিপদ হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমা কেন ?

চাঁদ গোলাকার, উহার ব্যাস ২১৬০ মাইল। পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া চাঁদ নিজের কক্ষের উপর পৃথিবীকে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে। উহার নিজের কোন আলো নাই। সূর্য্যকিরণ উহার উপর পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইলে আমরা যাহা দেখি তাহাই চাঁদের কিরণ—জ্যোৎস্না।

জান কি ?

পূর্ণিমা রাত্রে সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক লাইনে (এক সমতলে নহে) পরে পরে থাকে বলিয়া সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের অর্দ্ধেকখানি (যাহা পৃথিবীর দিকে মুখ করা) আলোকিত করে। তাই সে রাত্রিতে চাঁদের সবখানিই আলোতে উদ্ভাসিত দেখি। মাসে (২৮ দিনে) একবার মাত্র এই অবস্থা হইতে পারে।

পূর্ণিমার প্রায় ১৫ দিন পরে চাঁদ ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া থাকে তাহা সূর্য্যের আলো না পাওয়ায় আমরা অন্ধকার দেখি। সে রাত্রে আকাশে চাঁদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই ঘোর অন্ধকার, অমাবস্যা।

সূর্য্য প্রকাণ্ড। পৃথিবী সূর্য্যের আয়তনের তুলনায় বিন্দুমাত্র, চন্দ্র আরও কম। সুতরাং চন্দ্রের অর্দ্ধেকখানি সর্ব্বদাই সূর্য্যের আলোয় আলোকিত থাকে। আর চন্দ্রের একই দিক পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া সর্ব্বদা তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। সেই জন্যই আমরা প্রতি রাত্রেই চন্দ্রের একই 'কলঙ্ক' দেখিতে পাই। কিন্তু চন্দ্রের, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিবার জন্য, আলোকিত অংশের সবখানিই আমরা সব সময়ে দেখিতে পাই না, ফলে 'চন্দ্রকলার' উৎপত্তি হয়। পর পৃষ্ঠার ছবিটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে। অমাবস্যার পর প্রতি রাত্রেই চন্দ্রের আলোকিত অংশ (গ ঘ) আমরা ক্রমশঃই বেশী দেখিতে পাই। গ ঘ ক্রমশঃ বৃদ্ধি

পাইতে পাইতে ঘ আসিয়া পূর্ণিমার রাত্রে ক'এর সঙ্গে মিলিত হয়। আবার তেমনই পূর্ণিমার পর আলোকিত অংশ ক্রমশঃ
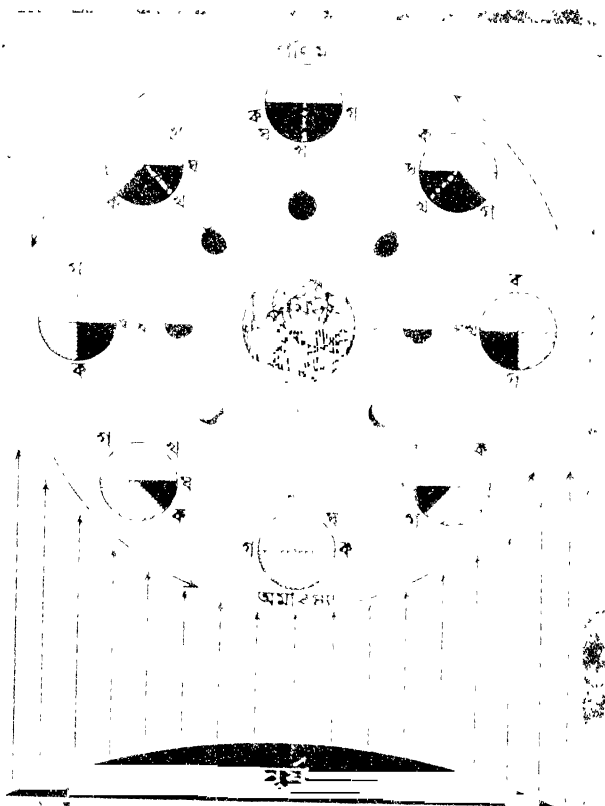
হ্রাস হইতে হইতে অমাবস্যায় একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়

জান কি ?

ক খ গ চন্দ্রের অর্দ্ধেক অংশ, যাহা সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া থাকে।

চন্দ্রের মত পৃথিবীরও নিজের কোন আলো নাই। সূর্য্যের আলো পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকেও খানিকটা আলোকিত করে। সেই জন্য অনেক সময় পরিষ্কার রাত্রে দ্বিতীয়ার চাঁদের কাস্তের মত আলোকিত অংশের বাহিরে চাঁদের বাকী অংশ আবছায়ার মত অস্পষ্ট দেখা যায়। চাঁদের আলো বেশী হইলেই আর ইহা দেখা যায় না। লক্ষ্য করিয়া না থাকিলে এইবার অমাবস্যার পর লক্ষ্য করিও।

সূর্য্যের স্বরূপ কি ?

প্রাতঃকালে সূর্য্য যখন 'জবাকুসুম-সঙ্কাশম্' রূপে পূব আকাশে উদিত হন তখন তাঁহাকে দেখায় একখানা রাঙ্গা থালা, আবার সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য যখন 'হেসে পাটে বসেন' তখনও একখানা রাঙ্গা থালা। দুপুরে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের দিকে তাকায় কার সাধ্য! কিন্তু একখানা পাতলা কাঁচে কেরোসিনের ডিবার শীষ হইতে কালি লাগাইয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখ; দেখিবে এবারেও সূর্য্যের আকৃতি একেবারে গোলাকৃতি একখানা সোনার থালা। সূর্য্য একটি উজ্জ্বল গোলাকার পিণ্ডবিশেষ।

সূর্য্যোদয়

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত ; আয়তনে পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮ হাজার মাইল, আর সূর্য্যের ব্যাস ৮,৬৬,৫০০ মাইল। হিসাব করা হইয়াছে পৃথিবীর ওজন ১৬২,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মণ, ইহার ৩,৩২,০০০ গুণ বেশী ওজন হইল সূর্য্যের। তাহা হইলে কত মণ হয় তোমরা কাগজ পেনসিল লইয়া হিসাব কর। কিন্তু এক বিষয়ে সূর্য্যকে আমাদের পৃথিবীর কাছে হার মানিতে হইয়াছে। সূর্য্য গ্যাসীয় পদার্থে তৈরি বলিয়া ঘনত্বে (density) পৃথিবীর মাত্র এক-চতুর্থাংশ, সুতরাং আয়তনের অনুপাতে ওজনে কম ভারী।

পৃথিবীকে ঘিরিয়া দুই শত মাইল উর্দ্ধ ব্যাপী যেমন একটি বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্য্যকে ঘিরিয়াও তেমনই একটি উজ্জ্বল ঘন হাইড্রোজেন-মণ্ডল আছে। আজ পর্য্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ (elements) আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্পেক্‌ট্রো-স্কোপ (spectroscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যে উহাদের ৬৬টির অবস্থিতি আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছে। উহারা জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় সূর্য্যের মধ্যে ও তাহাকে ঘিরিয়া আছে। আরও জানা গিয়াছে যে, উহাদের কতকগুলি গ্যাস সূর্য্যকে ঘিরিয়া ৫০০ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিলেও হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও ক্যাল্‌সিয়াম ৯ হাজারেরও বেশী মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আমাদের পৃথিবীর ভিতরকার তাপ খুব বেশী হইলেও ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত, কিন্তু সূর্য্যের বাহিরের তাপই ৭-৮ হাজার ডিগ্রি, আর ভিতরকার তাপ মাত্র ৪-৭ কোটী ডিগ্রি! ধারণা করিতে পার কি ? ভাবিয়া দেখ ১০০° ডিগ্রি তাপেই জল বাষ্পে পরিণত হয়।

সূর্য্য আছে বলিয়া পৃথিবীতে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতির খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছে। সূর্য্যের জন্যই আমরা রৌদ্র পাইতেছি, বৃষ্টি হইতেছে, বাতাস বহিতেছে, চাঁদ আলো দিতেছে, গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। সূর্য্যের জন্যই আজ ইঞ্জিন চলা সম্ভব হইয়াছে, আমরা নির্ভয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিতেছি, সাত সাগরের খবর করিতেছি, আকাশ-বিহার করিতেছি, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের খবর এক লহমায় লইতে পারিতেছি। সূর্য্যের প্রচণ্ড শক্তির মাত্র এক কণা কয়লা, পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত ছিল ; আজ সেই কণামাত্র শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে-দিন সূর্য্যের শক্তি নিঃশেষিত হইবে সেই দিন সূর্য্যপরিবারের কোন গ্রহেই জীবের বাস আর সম্ভবপর হইবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—সূর্য্য হইতে প্রতিসেকেণ্ডে তাপ হিসাবে যে শক্তি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার জন্য সূর্য্যের দেহ হইতে ১০,৮০০ কোটী মণ পদার্থ (mass) ক্ষয় হইতেছে! সেকেণ্ডে

সূর্য্যের কলঙ্ক

এই হিসাবে (rate) শরীরের ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিলে সূর্য্য আর কতদিন টিকিবে ? বড় ভাবনার কথা! কিন্তু এখনই ভাবিবার কিছুই নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হিসাব করিয়াছেন—এই রেটে খরচ হইলেও সূর্য্য সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইতে ১ কোটী ৫৫ লক্ষ বৎসর দরকার হইবে। সুতরাং—

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, কিছু নাই তোর ভাবনা!
নিঃশেষ হ'য়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না!

চন্দ্রের কলঙ্কের কথা তোমরা জান, পরিষ্কার চাঁদনি রাত্রে উহা দেখিয়াও থাকিবে। সূর্য্যের দেহেও কলঙ্ক (Sunspot) আছে। কিন্তু সূর্য্যের কলঙ্ক অন্য রকমের। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে আলোকমণ্ডল (photosphere) আছে, যাহার আলোয় পৃথিবী ও চন্দ্র আলোকিত, তাহাতে সময় সময় প্রবল ঝড় বহিতে থাকে—লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া ১৫।২০, এমন কি ৩০ দিন ধরিয়া সেই তাণ্ডব লীলা চলে। সেই সময় ঐ কলঙ্কগুলি বেশী করিয়া দেখা দেয়। উহারা সূর্য্যের দেহে বড় বড় গর্ত্ত। উহাদের এক একটির প্রসার এত বড় যে, আমাদের পৃথিবী অনায়াসে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে পারে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ কলঙ্কগুলি পরীক্ষা করিয়াই জানা গিয়াছে যে, সূর্য্য তাহার অক্ষের (axis) উপর ২৭ দিনে একবার আবর্ত্তন করে।

সময় সময় সূর্য্য হইতে অনলশিখা বাহির হইয়া আকাশের

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নিমণ্ডল

দিকে ছুটিয়া যায় এবং ঊর্দ্ধে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সূর্য্যগ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে গ্যাস দিনরাত জ্বলিতেছে, উহারা সেই অগ্নিমণ্ডলেরই (বর্ণমণ্ডল-chromosphere) শিখা,—হাজার হাজার মাইল ব্যাপী লেলিহান জিহ্বা!

পূর্ণগ্রহণের সময় সূর্য্যের আর একটি অপরূপ রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। চাঁদের কাল মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া স্থানে স্থানে লাল বর্ণমণ্ডল, আর উহাকে ঘিরিয়া একটি তীব্র আলোকের ছটা। সূর্য্যকে ঘিরিয়া এই মণ্ডল অবস্থিত। বর্ণমণ্ডলের গভীরতা স্থানে স্থানে দশ হাজার মাইল, কিন্তু ছটামণ্ডলের (corona) গভীরতা লক্ষ লক্ষ মাইল। সূর্য্যের প্রখর আলোকে অন্য সময় উহার অস্তিত্ব ঠিক পাওয়া যায় না।

এমন যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সৌরজগতাধিপতি সূর্য্য—এস আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি—

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

ঋতু পরিবর্ত্তন হয় কেন?

সূর্য্য বারমাস সেই একই পূবের দিকে উঠিয়া সন্ধ্যায় পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সেই একই সূর্য্য, সেই একই পৃথিবী, অথচ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে দারুণ গরম, আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে

'ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে, গাঙে ছোটে বান্', আশ্বিনে 'গা সিন্ সিন্', পৌষে প্রচণ্ড শীত, মাঘ ফাল্গুনে মিষ্টি মধুর হাওয়া; গ্রীষ্মে দিন বড় আর রাত ছোট, আর শীতে বড় রাত আর ছোট দিন হয় কেন? ২৪ ঘণ্টার দিন-রাত ভাগ হইয়া ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত হওয়াই তো উচিত ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখি না কেন?

পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় বৃত্তাকার একটি পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পথটি একটি সমতল ক্ষেত্রের

১নং চিত্র

প্রান্ত দিয়া গিয়াছে এবং বৃত্তাকার সমতল ক্ষেত্রটি সূর্য্য ও পৃথিবীর পেটের মধ্য দিয়া গিয়া উহাদিগকে দুই সমান ভাগে ভাগ করিয়াছে। এই পথে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন, এদিকে পৃথিবী নিজেও তাহার অক্ষের (axis) উপর ঘুরিতেছে এবং নিরক্ষ রেখার (equator) নিকট এই ঘুরিবার বেগ ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার মাইল। ইহাতে পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্যের দিকে থাকে তখন সেখানে

হয় দিন, আর সূর্য্যরশ্মি-বঞ্চিত পিছনের অংশে রাত্রি। একই স্থানে পর পর রাত্রি, দিন, আবার রাত্রি হওয়াতেও পৃথিবীর আহ্নিকগতি প্রমাণ করিতেছে।

পৃথিবীর অক্ষরেখা সূর্য্যকে ঘুরিবার সময় যদি সমতল ক্ষেত্রের ধারে উহার সহিত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া (perpendicularly) থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে দিন রাত্রি হইত
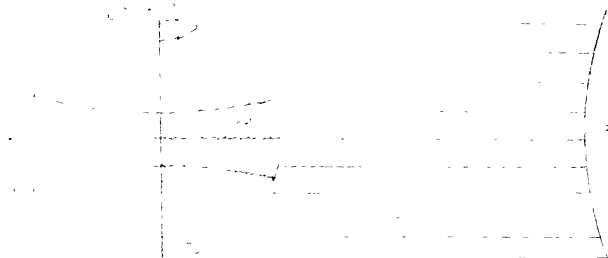
২নং চিত্র

সমান, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা করিয়া এবং সূর্য্য বার মাসই পৃথিবীর নিরক্ষ রেখার উপর থাকিয়া উহার উপর কিরণ বর্ষণ করিত। তাহার ফলে নিরক্ষ রেখা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সূর্য্য-কিরণ সোজাভাবে পড়িত, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে সূর্য্যরশ্মি ক্রমশঃ হেলিয়া পড়িত। ইহাতে নিরক্ষ রেখা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে হইত অসহ্য গরম, কিন্তু মেরুর দিকে ক্রমশঃ

ঠাণ্ডা এবং মেরু প্রদেশে প্রচণ্ড শীত। বৎসরে কোন স্থানেই ঋতু পরিবর্ত্তন হইত না, কোন স্থানে গরম ঠাণ্ডার তারতম্য হইত না। কারণ সেই স্থান বার মাস ধরিয়া একই ভাবে সূর্য্যের তাপ পাইত, আর দিন রাত্রি হইত সমান।

কিন্তু তাহা না হইয়া শীতকালে দিন ১০½ ঘণ্টা ও রাত্রি ১৩½ ঘণ্টা এবং গ্রীষ্মকালে তাহার উল্টা হয় কেন? মেরু প্রদেশে ক্রমাগত ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রিই বা হয় কেন? এই বাংলা দেশেই শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর আবির্ভাব ও তিরোভাবই বা হয় কেন?

ইহার কারণ পৃথিবীর অক্ষ সূর্য্যকে ঘুরিবার সমতল ক্ষেত্রের সহিত লম্বভাবে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া ৬৬½° ডিগ্রি কোণ করিয়াছে, এবং পৃথিবীর অক্ষ বারমাস চব্বিশ ঘণ্টা সমতল ক্ষেত্রের সহিত একই কোণ করিয়া একই দিকে হেলান থাকিয়া সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাক্।

ঋতু-পরিবর্ত্তন

৩নং চিত্রটি দেখ, ১০ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ) ও ১০ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পথের এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় যখন সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক নিরক্ষ রেখার উপর থাকে। সুতরাং এই দুই দিন সূর্য্যের

৩নং চিত্র
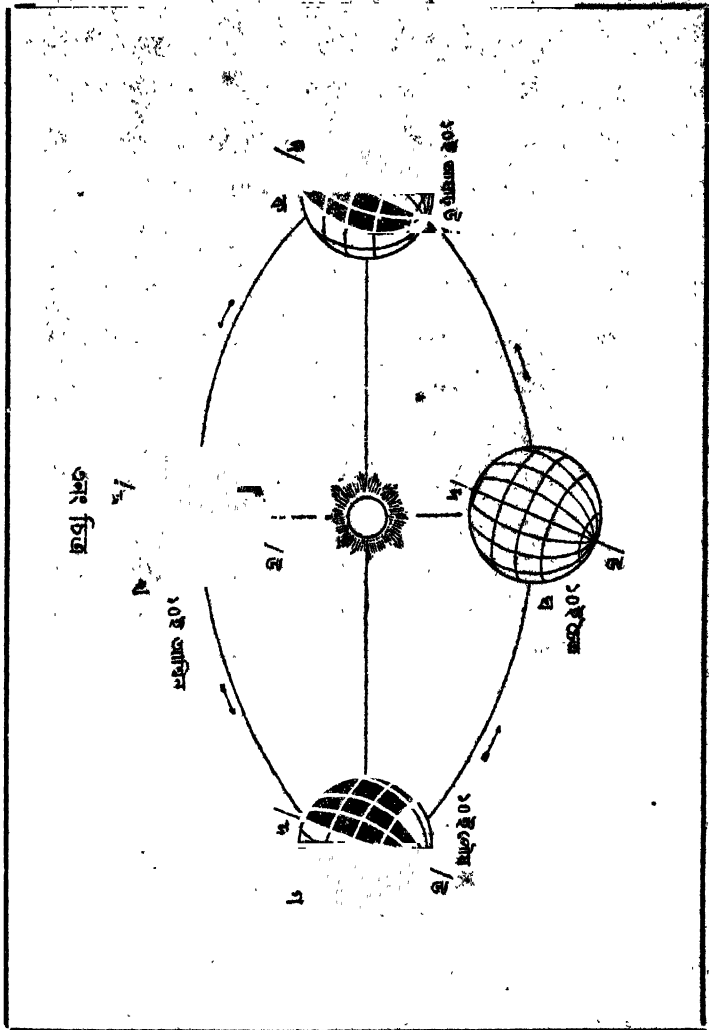
জান কি ?

আলো পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে সমানভাবে পড়ে। তাহাতে পৃথিবীর সকল স্থানেই দিবারাত্রি সমান হয়। ১০ই চৈত্র আমাদের দেশে পূর্ণ বসন্ত ঋতু এবং ১০ই আশ্বিন পূর্ণ শরৎ ঋতু। ১০ই আষাঢ় (২১শে জুন) পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থিতি এমন হয় যে, পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে ২৩½° হেলিয়া পড়ে। উহাতে উত্তর গোলকার্দ্ধ সূর্য্যের তাপ

৪নং চিত্র

বেশীক্ষণ ধরিয়া পায় এবং সূর্য্য থাকে ঠিক কর্কটক্রান্তির (Tropic of Cancer) উপর। এই সময় তথায় ভরা গ্রীষ্ম ঋতু ; আর দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ বেশীক্ষণ অন্ধকারে থাকায় সেখানে ভরা শীত ঋতু।

১০ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থান

১০ই আষাঢ়ের ঠিক বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সময় উত্তর মেরু দূরে চলিয়া যায় এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সুতরাং একই নিয়মে উত্তর গোলকার্দ্ধে শীত ঋতু এবং দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হয়। সূর্য্য তখন মকরক্রান্তির (Tropic of Capricorn) উপর থাকে।

আমরা দেখিলাম সূর্য্যরশ্মি সোজাভাবে যেখানে পড়ে সেখানে গরম, আর যেখানে যত হেলিয়া পড়িবে সেখানে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইবে। কেন? পৃথিবীকে ঘিরিয়া একটি বায়ুমণ্ডল আছে। পৃথিবীর উপর সূর্য্যরশ্মি লম্বভাবে পড়িলে পৃথিবীর যতখানি স্থান উত্তপ্ত হয়, হেলিয়া পড়িলে তদপেক্ষা বেশী স্থান জুড়িয়া সেই একই রশ্মি পড়ে, কাজেই পশ্চাদুক্ত স্থানের (ক) প্রত্যেক অংশ পূর্ব্বোক্ত স্থানের (খ) প্রত্যেক অংশ হইতে কম তাপ পায়। ইহা ব্যতীত হেলিয়া পড়া রশ্মিকে বায়ুস্তরও ভেদ করিতে হয় বেশী। তাহাতেও অনেকখানি তাপ কমিয়া যায়। উপরোক্ত দুই কারণে যে সব স্থানে সূর্য্যরশ্মি হেলিয়া পড়ে সেই সকল স্থান শীতল হয়। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় সূর্য্যতাপের যে তারতম্য আমরা লক্ষ্য করি তাহাও এই একই কারণে হয়।

এখন বুঝা গেল—পৃথিবীর ঘুরিবার পথে সূর্য্য ও পৃথিবীর অবস্থানের উপর শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। কিন্তু দিন ও রাত্রি ছোট বড় হয় কেন? ৫নং চিত্রটি

দেখ। ৫ (ক) চিত্রে যে অবস্থা দেখান হইয়াছে উহা সূর্য্য ও
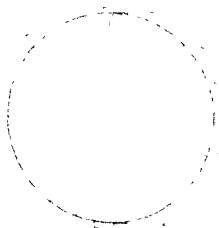
৫নং চিত্র

পৃথিবীর ১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্রের অবস্থা। ঐ দুই দিন

সূর্য্য ঠিক পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের উপর থাকে। ক খ গ ঘ বৃত্তটি দেখ। বৃত্তটির খ গ ঘ অংশ ঘ ক খ অংশের সমান, অর্থাৎ পৃথিবীর অর্দ্ধেকখানি সূর্য্যের আলো পাইতেছে আর অর্দ্ধেকখানি অন্ধকারে ; কাজেই দিন রাত সমান।

কিন্তু ৫ (খ) চিত্রটি দেখ। ইহা ১০ই আষাঢ়ের অবস্থা। সূর্য্য এখন ঠিক কর্কটক্রান্তি বৃত্তের উপর অবস্থিত। উত্তর মেরু প্রদেশ (চ ছ বৃত্ত) সব সময়েই আলো পাইতেছে, দক্ষিণ মেরু প্রদেশ (জ ঝ বৃত্ত) সব সময়েই অন্ধকারে রহিয়াছে। এই অবস্থা দুই মেরুতে ছয় মাস ধরিয়া চলে বলিয়া উত্তর মেরুতে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা যায় ও দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা যায় না। আবার ১০ই পৌষ হইতে ঠিক ইহার উল্টা অবস্থা হয়।

এখন ক খ গ ঘ বৃত্তটি দেখ। খ গ ঘ অংশ আলোকিত, ঘ ক খ অংশ আলোক-বঞ্চিত। দেখিলেই বুঝিবে বৃত্তটির খ গ ঘ অংশ ঘ ক খ অংশ হইতে আয়তনে বড়। সুতরাং পৃথিবীর বেশী অংশ সূর্য্যের আলোক পাইতেছে ; কাজেই দিন বড়, রাত্রি ছোট। তেমনই ৫ (গ) চিত্রে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা হইবে, তখন সূর্য্য মকরক্রান্তি বৃত্তের উপর থাকে। কাজেই রাত্রি হয় বড়, আর দিন হয় ছোট।

উপরে পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থানের যে কথা বলিলাম,

তাহা তোমরা নিজেরা অতি সহজেই পরীক্ষা করিতে পার। বাজারে এক আনা দিলে একটা ছোট রবারের বল্ কিনিতে পাইবে। পুরাতন টেনিস্ বল্ হইলেও চলিবে। বল্‌টিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া উহার উপরে কালি দিয়া একটি বৃত্ত আঁকিয়া দেও। সেইটি উহার নিরক্ষ বৃত্ত ; উহার উপর ও নীচে ২৩½° ডিগ্রি তফাতে আর দুইটি বৃত্ত অঙ্কিত কর—তাহারা হইবে কর্কটক্রান্তি বৃত্ত ও মকরক্রান্তি বৃত্ত। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর নিকট আর দুইটি বৃত্ত নিরক্ষবৃত্ত হইতে ৬৬½° ডিগ্রি তফাতে আঁকিয়া দেও, উহারা হইবে সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত। এইবার একটি লোহার শলাকা লইয়া বল্‌টির উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়া চালাইয়া দেও, সেই শলাকাটি হইবে পৃথিবীর অক্ষ (axis)। একখানা গোল টেবিল লও। টেবিলের উপরটা হইবে পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সমতল ক্ষেত্র, উহারই ধার দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে বৎসরে একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করে। এখন একটি অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি কর। টেবিলটি ঘরের মধ্যে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ছোট মোমবাতি জ্বালিয়া দেও। এইবার টেবিলখানার ধার দিয়া টেবিলরূপী সমতল ক্ষেত্রের সহিত বলের শলাকাটি ৬৬½° ডিগ্রি কোণ করিয়া এবং একই ভাবে তাহাকে হেলান রাখিয়া মোমবাতিকে প্রদক্ষিণ কর। টেবিলের সমতল উপরিভাগ যেন বল্‌টির

নিরক্ষ রেখার সমসূত্রে সর্ব্বদাই থাকে। এইবার দেখিবে, দুই অবস্থায় বলটির একদিক সমানভাবে আলোকিত হইবে, এক অবস্থায় উত্তরার্দ্ধে শলাকাটি মোমবাত্তির দিকে হেলিবে, আর এক অবস্থায় উহা হইতে দূরে চলিয়া যাইবে এবং এই অবস্থায় আলো ও অন্ধকারের তারতম্যও হইবে।

পৃথিবী কি সত্যই ঘোরে ?

এই কলিকাতা সহরে বসিয়াই আমরা রোজই দেখি সূর্য্যদেব সকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া বিকালে পশ্চিমাকাশে অস্ত যান, আবার পরের দিন ভোরে তিনি পূর্ব্বাকাশেই দেখা দেন। তাহা হইলে তো আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, সূর্য্যই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া তাহার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব আমাদের পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে?—শুধু তাহাই নহে, এই ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও তাহার অক্ষের উপর প্রচণ্ড-বেগে আবর্ত্তন করিতেছে ?

আমরা প্রত্যেক দিন যাহা দেখিতেছি তাহাতে ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হইতেছে যে, হয় সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, আর না হয় তাহার বিপরীত কাণ্ড হইতেছে। ইহার কোন্‌টা ঠিক ?

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

অঙ্ক কষিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ইহা স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ, সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৩ লক্ষ গুণ বড় এবং সূর্য্য পৃথিবী হইতে সোয়া ৯ কোটি মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। সুতরাং সূর্য্যকে যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতে হইত, তবে তাহার গতিবেগ হইত কত —তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখ। উহা কল্পনাতীত। তাহা ভিন্ন অতবড় সূর্য্য—তুলনায় অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিবে, তাহা কি বিজ্ঞান-সম্মত ?

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত হইবার পর হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে ও হইতেছে। দেখা গিয়াছে—উহারা সকলেই নিজ নিজ অক্ষের উপর আবর্ত্তন করিতেছে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। সুতরাং সে-ই বা কেন আবর্ত্তন করিবে না ?

সূর্য্য ও পৃথিবী দুইজনেই মহাশূন্যে অবস্থিত হইয়া একজন অন্যজনকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকার পথে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই ঘোরা সম্ভব দুইটি শক্তির সামঞ্জস্যে। একটি শক্তি ঘূর্ণ্যমান পদার্থটিকে কোলের দিকে টানিয়া রাখে, অন্যটি উহাকে সাম্‌নের দিকে চালিত করে। একগাছি সূতায় একটি ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাও, তোমাকে কেন্দ্র করিয়া ঢিলটি তোমার

চারিদিকে ঘুরিবে, কিন্তু সূতাটি ছাড়িয়া দাও, ঢিলটি ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া যাইবে। সূর্য্যই যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তবে পৃথিবী সূর্য্যকে টানিয়া রাখিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ১৩ লক্ষগুণ বড় ও সোয়া ৯ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যকে
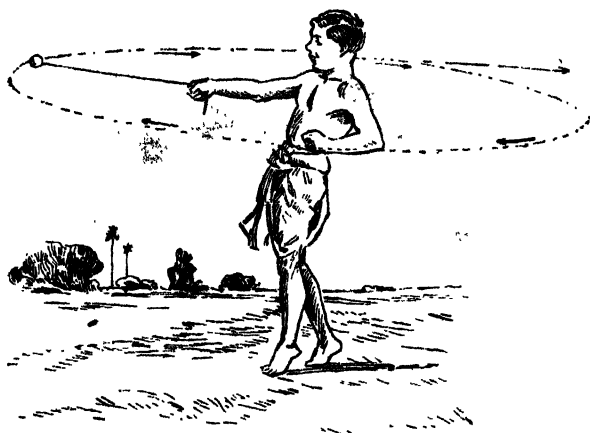
নিজের দিকে টানিয়া রাখিবার প্রচণ্ড শক্তি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী কোথায় পাইবে ?

ফ্রান্সের বোলন ও জার্ম্মানির হামবুর্গ সহরে নিম্ন-বর্ণিত পরীক্ষাটি করা হইয়াছিল।—আমরা দেখি উপর হইতে কোন ভারী পদার্থ ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক সোজা ভাবে নীচে পড়ে। কিন্তু এই পরীক্ষাটিতে নিবাত অবস্থায় ২৫০' ফুট উচ্চ স্থান

হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রস্তর-খণ্ডটি মাটিতে পড়িলে দেখা গেল যেখানে পড়া উচিত ছিল সেখানে না পড়িয়া উহা ৳ ইঞ্চি পূবে সরিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর গতির জন্যই উহা সম্ভব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—কোন স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইলে উহা হাল্কা হয়। তখন চারিদিকের ভারী শীতল বাতাস উহাকে ঠেলিয়া উপরে উঠাইয়া দেয়। শীতল বাতাসের গতির ফলে জোরে বাতাস বহিতে থাকে। বিষুব রেখার উপর ও নিকটবর্ত্তী স্থান উহাদের উত্তর ও দক্ষিণের স্থান হইতে গরম, কাজেই উত্তর দক্ষিণ দিক হইতে শীতল বায়ু বিষুব
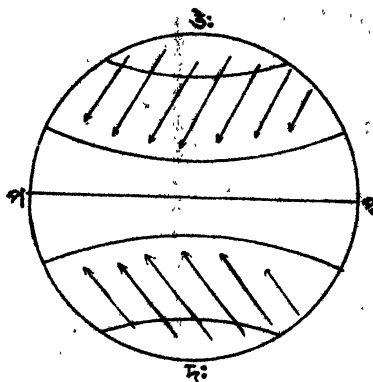
রেখার দিকে এই অবস্থায় সোজা প্রবাহিত হওয়া উচিত; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখা যায় না। দেখা যায়—উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে বায়ু প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলেই ইহা সম্ভব।

কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিলেন

ফুকো সাহেব। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ সহরে তিনি তাঁহার পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। প্যান্থিওন (Pantheon) নামক গির্জ্জার ছাদ হইতে ২০০ ফুটের অধিক লম্বা সুতা দিয়া প্রায় ১ ফুট ব্যাসের একটি লৌহ-গোলক তিনি ঝুলাইয়া দিলেন। গোলকের নীচে ভূমির উপর বালুকা ছড়ান
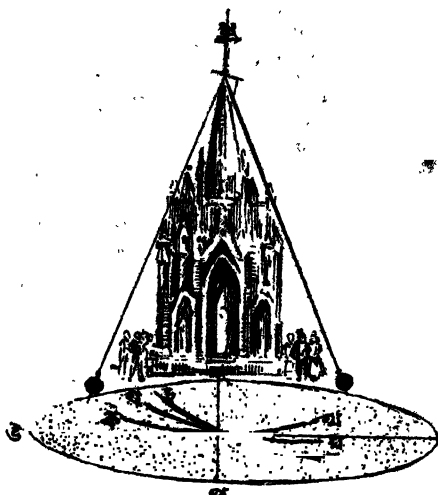
হইল এবং গোলকের নীচের দিকে একটা পিন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যাহাতে দুলিবার সময় দোলকটি বালির উপর প্রত্যেক বারেই একটি করিয়া দাগ অঙ্কিত করে। দোলকটি অতি সাবধানে উত্তর-দক্ষিণে দোলাইয়া দেওয়া হইল

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল—দাগগুলি ঘড়ির কাঁটার মত ক্রমশঃই পূবের দিকে বাঁকিয়া যাইতেছে।

দাগগুলি বাঁকিয়া যাইতেছিল কেন ? সহজে ও আস্তে আস্তে ঘুরান যায় এমন একখানি গোল টেবিলের উপর বসান
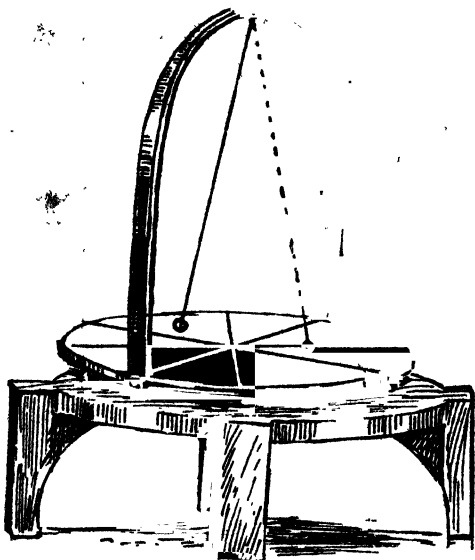
একটি শক্ত দণ্ডের উপর হইতে একটি ছোট লোহার বল্ ঝুলাইয়া দেও, এইবার বল্‌টি দোলাইয়া দিলে ঘড়ির দোলকের মত বল্‌টি এদিক ওদিক একই ভাবে ও একই পথে যাতায়াত করিবে। এ অবস্থায় টেবিলটি আস্তে আস্তে ঘুরাইলে দেখা

যাইবে বল্‌টি নিজের দুলিবার পূর্ব্ব পথেই দুলিতেছে—যদিও টেবিলটি এবং সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটিও ঘুরিয়া গিয়াছে। সুতরাং দণ্ডের গতির সহিত দোলকের গতিপথের কোন সম্বন্ধ নাই। পরীক্ষাটি করা অতি সহজ তোমরা নিজেরাও করিতে পার।

তাহা হইলে বুঝা গেল, ফুকোর পরীক্ষায় বালির উপর দাগের দিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? দোলক একই পথে দুলিতেছিল; কিন্তু ঘুরিতেছিল পৃথিবী। সুতরাং বালির উপর দাগও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—পৃথিবী কোন্‌দিকে ঘুরিতেছে? আমরা সূর্য্যকে পূর্ব্ব দিকে উঠিয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখি, তাহা হইলে পৃথিবী ঘুরিতেছে পশ্চিম হইতে পূবে। তোমরা যাহারা রেলগাড়ীতে চড়িয়াছ তাহারা জান—রেলগাড়ী যখন দুইটি ষ্টেশনের মধ্যে পূর্ণগতিতে ছুটিয়া চলে, তখন মনে হয় মাঠের কোলে অচলগাছের সারি যেন গাড়ীর উল্টা দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যাইতেছে; আর তোমাদের গাড়ী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গতি-বিজ্ঞানের নিয়মই এই। সূর্য্য যখন স্থির, তখন পৃথিবীই সূর্য্যের আপাতগতির বিপরীত দিকে ছুটিতেছে—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া। আর তাহারই ফলে হইতেছে রাত্রি ও দিন।

গাছে পাতা হয় কেন ?

সবুজ পাতার শ্যামল শোভায় তোমাদের চোখ জুড়াইয়া যায়। কিন্তু তোমরা জান কি সবুজ পাতা না থাকিলে জীব-জগতের আহার বন্ধ হইয়া যাইত—খাইতে না পাইয়া তুমি, আমি, সারা পৃথিবীর পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা সকলেই মরিয়া যাইত? পৃথিবী জীবশূন্য হইত? কথাটা তোমরা বিশ্বাস করিলে না।

আমাদের আহার্য্য চা'ল, দাল, আটা, ময়দা, তরিতরকারি প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষভাবে গাছ হইতে সংগ্রহ করি। দুধ, ঘি প্রভৃতি গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ হইতে পাই; কিন্তু তাহারা গাছপালা খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদিগকে ভুসি, ঘাস, খৈল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাওয়াইলে তবে দুধ দেয়।

পাতা

মাছ, মাংস প্রভৃতি যাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা আহার সংগ্রহ করি, তাহারাও হয় তৃণভোজী, আর না হয় মাংসাশী। মাংসাশী প্রাণীরাও আবার তৃণভোজী প্রাণী হত্যা করিয়াই তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। অন্যান্য জীবজন্তুর আহার সংগ্রহের বিষয়েও এই একই ব্যবস্থা। তাহা হইলে দেখা

গেল—সমস্ত প্রাণিজগৎ—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গাছপালার নিকট হইতেই তাহাদের আহার্য্য বস্তু পাইয়া থাকে।

গাছপালা এই খাদ্য কোথায় এবং কি প্রকারে তৈয়ার করে? তৈয়ার করে সবুজ পাতায়। গাছের খাদ্য-দ্রব্য মাটিতে ও বাতাসে থাকে। মাটি হইতে শিকড়ের সাহায্যে জলীয় অবস্থায় খাদ্য-দ্রব্য আহরণ করিয়া গাছ তাহাকে পাতায় আনে। গাছ বাতাস হইতে কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস শোষণ করিয়া পাতার ভিতর টানিয়া লয়। তাহার জন্য পাতার ত্বকে লক্ষ লক্ষ প্রবেশ-পথ আছে। প্রত্যেকটি প্রবেশ-পথে একটি করিয়া দরজা, দরজায় তুইটি পাল্লা। গাছ ইচ্ছা করিলেই পাল্লা তুইটি ভেজাইয়া প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। রাত্রে পথগুলি সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে।

পাতার ভিতরে অসংখ্য কোষ (cell) আছে; সেই কোষগুলি দ্বারা পাতা নির্ম্মিত। কোষের ভিতর থাকে অসংখ্য সবুজ-কণিকা। সবুজ-কণিকার সবুজবর্ণের জন্য পাতা দেখিতে সবুজ। কণিকাগুলি প্রাণবস্তুর (Protoplasm) অংশবিশেষ, আর সবুজবর্ণকে ক্লোরোফিল বা পত্র-হরিৎ বলে। পত্র-হরিতের ক্ষমতা অদ্ভুত। সূর্য্যকিরণ যখন সবুজ পাতার উপর পতিত হয়, তখন তাহার লোহিত-রশ্মি (red rays) পত্র-হরিৎ শোষণ করিয়া ধরিয়া রাখে। সূর্য্যকিরণের সাতটি রশ্মির প্রধানতঃ এই লোহিত-রশ্মির জন্যই আমরা রৌদ্রে

উত্তাপ অনুভব করি। উত্তাপ, শক্তির (energy) একপ্রকার বিকাশ।

গাছ মাটি হইতে শোষিত জল ও বাতাস হইতে গৃহীত কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগ সংঘটিত করিয়া শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু এই রাসায়নিক সংযোগ করিতে যে শক্তির দরকার গাছ তাহা পায় কোথায় ?
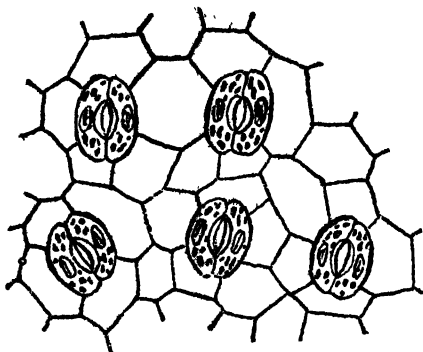
পাতায় গ্যাস প্রবেশের পথ

ক্লোরোফিলের সাহায্যে সবুজ-কণিকা সূর্য্যকিরণ হইতে এই শক্তি আহরণ করে এবং সেই শক্তির সাহায্যে অজৈব খাদ্যদ্রব্য হইতে জৈব খাদ্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা একমাত্র সবুজ পাতারই আছে, অন্য কাহারও নাই। অবশ্য গাছের অন্যান্য সবুজ অংশেও কিয়ৎ-পরিমাণে এই খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনিক খাদ্য প্রস্তুতের সহিত তুলনা করিলে—

সবুজ পাতা—রান্নাঘর,

সবুজ-কণিকা—পাচক ঠাকুর

ক্লোরোফিল—দেশলাই

সূর্য্যকিরণ—রান্নার আগুন

পত্র-ছিদ্র—রান্নাঘরের দরজা, যাহার ভিতর দিয়া কার্ব্বন-ডায়কসাইড ও অক্সিজেন যাতায়াত করে।

মরীচিকা কি ?

'মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে'

—মাইকেল

যাত্রী উটের পিঠে চড়িয়া মরুভূমি পাড়ি দিতেছে, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। দূরে, বহুদূরে আকাশের কোলে সে দেখিল মরূদ্যান-নীচে পুকুর, তা'তে জল থৈ থৈ করিতেছে, খেজুর-গাছের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। জল ও আশ্রয় পাইবার আশায় তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! সারাদিন চলিয়াও সে মরূদ্যানের নিকটে পৌঁছিতে পারিল না। সে যত আগাইয়া চলিল মরূদ্যানও ততই পিছাইয়া গেল। অবশেষে সূর্য্য অস্ত-যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা অদৃশ্য হইয়া গেল, আশায় মুগ্ধ হইয়া যাহার পিছনে পথিক ছুটিয়াছিল তাহাই মরীচিকা।

মরীচিকার কারণ বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে দুইটি পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রথম একটি বাটি লইয়া তাহাতে একটি পয়সা কিংবা টাকা রাখ। বাটিটি টেবিলের উপর রাখিয়া একটু দূর হইতে দেখ,—টাকাটি দেখিতে পাইবে না।

এইবার সেইখানে দাঁড়াইয়াই কাহাকেও আস্তে আস্তে বাটিটিতে জল ঢালিতে বল। বাটি জলপূর্ণ হইবা মাত্র পূর্ব্বের অদৃশ্য টাকাটিকে এখন দেখিতে পাইবে। ইহার কারণ কি ?

ঘর ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, বাতি জ্বাল সবই দেখিতে পাইবে। কোন জিনিসই বিনা আলোকে আমরা দেখিতে পাই না, আলোক হইতে রশ্মি আসিয়া জিনিসে
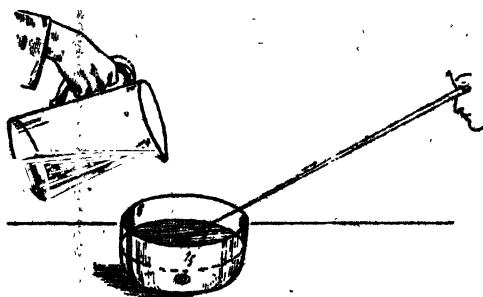
প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে পৌঁছিলে আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই। টাকাটি যখন খালি বাটির ভিতর ছিল তখন তাহা হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি তোমার চোখে না পৌঁছায় টাকাটিকে দেখিতে পাও নাই। কিন্তু বাটিতে জল ঢালায় প্রতিফলিত রশ্মি জল হইতে বাহির হইবার সময় বাঁকিয়া তোমার চোখে লাগায় টাকাটিকে তুমি দেখিতে পাইলে।

একখানি সোজা লাঠি লইয়া চৌবাচ্চার স্বচ্ছ জলের মধ্যে উহার খানিকটা প্রবেশ করাও। লাঠিখানির জলের ভিতরের অংশ বাঁকা দেখা যাইবে। কেন ? ওই একই কারণে। জল হইতে প্রতিফলিত রশ্মি বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বাঁকিয়া যায়।

এক মিডিয়ম (medium) হইতে ভিন্ন মিডিয়মের ভিতর দিয়া যাইবার সময় রশ্মির বাঁকিয়া যাওয়াকে আলোকের **প্রতিসরণ** (refraction) বলা হয়। আলোকের প্রতিসরণের জন্যই মরীচিকার সৃষ্টি হয়।

খুব গরমের সময় বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (in different degrees) উত্তপ্ত হয়। কাজেই তাহাদের ঘনত্বও (density) পৃথক্ হয়। তখন তাহারা একই বায়ু হইলেও কার্য্যতঃ পৃথক্ মিডিয়মের মত ব্যবহার করে। প্রতিফলিত রশ্মি এই প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিসরিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত গ্রীষ্মে কাঠফাটা রৌদ্রের সময় মাঠে দাঁড়াইলে দেখিতে পাইবে যেন মাটি হইতে বাষ্প উঠিতেছে। ইহাও

একপ্রকার মরীচিকা বলিতে পার, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উত্তপ্ত স্তরের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বাঁকিয়া চলার দরুণই এই রকম দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাষ্প বলিয়া কোন পদার্থ সেখানে মাটি হইতে উঠে না।

বহুদূরে দৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত একটি মরূদ্যানে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঘোরা পথে চোখে আসিয়া পৌঁছে।
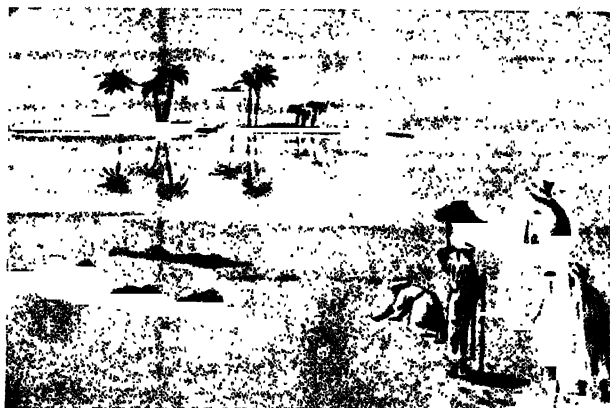
মরুভূমি—মরীচিকা

মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বনিম্ন স্তর গরম হয়। তাহার উপরকার স্তর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উত্তপ্ত হওয়ায় তাহাদের আলোক প্রতিসরণ-ইণ্ডেক্সও (refractive index)

পৃথক্ হয়। সুতরাং মরূদ্যান হইতে প্রতিফলিত রশ্মি এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া চলিবার সময় ক্রমশঃ বাঁকিয়া উপরের ঠাণ্ডা স্তরে পৌঁছিয়া প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় নীচের দিকে প্রতিসরিত হইতে হইতে পথিকের চোখে আসিয়া পৌঁছায়। তখন সে মরূদ্যানটি দেখিতে পায়। মরূদ্যানের নীচে যে পুকুরের মত দেখায় তাহা নীল আকাশের প্রতিসারিত প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

প্রতিধ্বনি কি ?

ডাকেন জননী— নিমাই ! নিমাই !
প্রতিধ্বনি বলে— নাই নাই নাই ;
ডাকিছেন যত শোকসিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে ! কোথা রে নিমাই !
গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে
সেই প্রতিধ্বনি যাই, যাই করে।

প্রতিধ্বনি (echo) কি ? বড় একটি দেওয়ালের সাম্নে দাঁড়াইয়া কিংবা একটা খাড়া পাহাড় কি গুহার মুখে দাঁড়াইয়া, সজোরে চীৎকার করিলে তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নির্জ্জন প্রান্তরে, কিংবা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া কাহারও নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলে, মনে হইবে—পরপার হইতে কেহ

জান কি ?

পরক্ষণেই সেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া তোমাকে অনুকরণ করিতেছে। সত্যই তো আর কেহ তোমার মুখ ভেঙ্গাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে না, তবে কেন এমন হয় ?

আলোকরশ্মির মত শব্দতরঙ্গও চলিতে চলিতে বাধা পাইয়া প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত শব্দকেই আমরা প্রতিধ্বনি বলি। শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট গতিতে চলিয়া থাকে। সুতরাং কোন দেওয়াল হইতে ৫৫০ ফুট দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিলে ঠিক এক সেকেণ্ড পরে সেই নামের প্রতিধ্বনি তোমার কানে পৌঁছিবে।

যখন loud speaker কিংবা শব্দকে সজোর করিবার কোন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তখন বক্তৃতামঞ্চের ঠিক পিছনে একটা বেশ বড় রকমের কাঠের প্রতিফলক (reflector) বসান থাকিত। আর সেটা হিসাব করিয়া এমন স্থানে বসান হইত যে, বক্তার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই কথাটিকে জোরাল করিয়া দিত, ফলে বক্তৃতাগৃহের শেষ পর্য্যন্ত সে কথাটি পৌঁছিত। তোমাদের যাহাদের সুবিধা আছে তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বক্তৃতামঞ্চের পিছনের প্রতিফলকটি দেখিয়া আসিও।

প্রতিধ্বনিকেও মানুষ তাহার কাজে লাগাইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট গতিতে চলিতে

থাকে, প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাহা কতদূর হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সহজ। শব্দ করা ও তাহার প্রতিধ্বনির মধ্যে যদি এক সেকেণ্ড ব্যবধান হয়, তবে জানিতে হইবে প্রতিফলক ৫৫০ ফুট দূরে আছে। রাত্রে কিংবা ঘনকুয়াসার মধ্যে সমুদ্রের কিনারা দিয়া যখন জাহাজ চলে, সেই সময়, চড়ায় অথবা জলমগ্ন পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া যাহাতে জাহাজ বানচাল না হয়, তাহার জন্য, প্রতিধ্বনির দূরত্ব মাপিবার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়।

গাছে ফুল ফোটে কেন ?

আমাদেরই কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—

মানুষ তাহার বাগানে নানাপ্রকারের ফুলের গাছ লাগায়। শীতকালের ফুল, গ্রীষ্মের ফুল, বর্ষার ফুল! ফুলের প্রকারই বা কত, আর বর্ণ-বৈচিত্র্যই বা কত!—গন্ধই বা কি মনোরম! মানুষ তাহার যত কিছু ভাল—তাহা ফুলের উপমা দিয়াই প্রকাশ করে; যেমন 'ফুলের মত কোমল', 'ফুলের মত পবিত্র', ইত্যাদি। ফুল ভালবাসে না—এমন মানুষ খুব কমই আছে। ফুল বাদ দিয়া কোন মাঙ্গলিক কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। গাছ

জান কি ?

যে তাহার দেহে ফুল ফুটায়—তা কি মানুষ তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবে বলিয়া ?

যে সব গাছে ফুল ফোটে, তাহারা সাধারণতঃ বীজ দিয়া
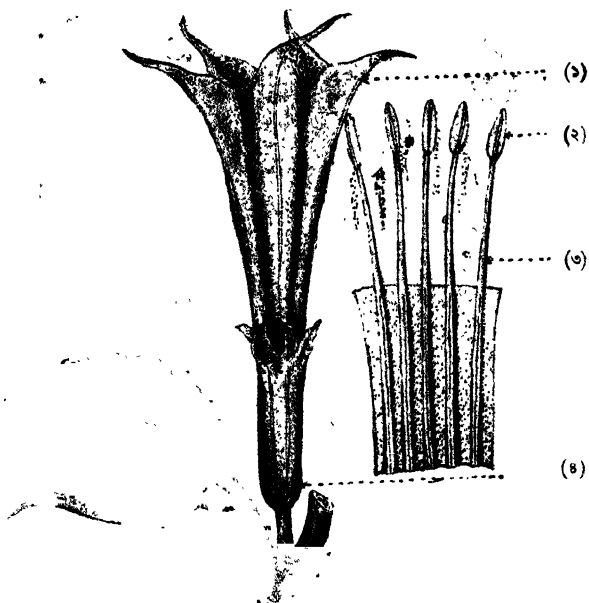
ধুতুরা ফুল

১। ফুলের পাপড়ি
২। পরাগ বা পুংরেণুর থলে
৩। পরাগ-থলের লম্বা বোঁটা বা দণ্ড
৪। ফুলে বাহিরের আবরণ

বংশ রক্ষা ও বিস্তার করে। বীজের ভিতর থাকে গাছের

ভবিষ্যৎ শিশু—সুপ্ত অবস্থায়। গাছ-শিশু জন্মে পরাগরেণুর গর্ভকেশরের মুণ্ডে লাগিবার পরে।

গোলাপ, চাঁপা, জবা, ধুতুরা প্রভৃতির ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই সঙ্গে থাকে, কিন্তু কুমড়া গাছে পুংকেশর ও
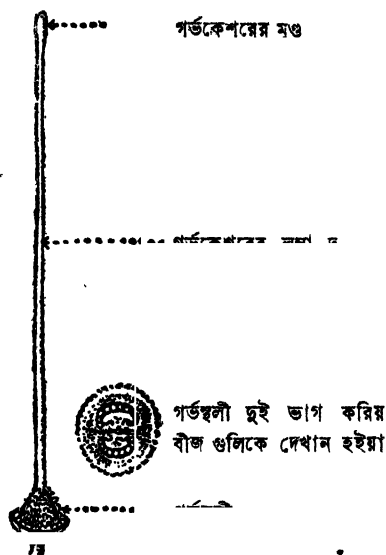
ধুতুরা ফুলের গর্ভকেশর

গর্ভকেশর পৃথক্ পৃথক্ ফুলে থাকে, আবার পেঁপের মত গাছে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গাছে উৎপন্ন হয়।

গাছ অচল জীব। তাহা হইলে পরাগরেণু ও গর্ভকেশরের

জবাফুল—(১) বহিরাবরণ (২) পাপড়ি (৩) পুংকেশর
(৪) গর্ভনলী (৫) গর্ভকেশর (৬) গর্ভস্থলী

সংযোগ ঘটাইবে কে ? এই সংযোগ না হইলে গাছের ভবিষ্যৎ শিশু জন্মিবে না। তবে কি স-পুষ্পক গাছের বংশ লোপ হইবে ? না, তাহা হয় না। কীট-পতঙ্গ এই মিলন ঘটায়, কিন্তু কীট-পতঙ্গ ফুলের কাছে আসিবে কেন ? তাই ফুলের অমন বর্ণ-বৈচিত্র্য, অত মনোরম গন্ধ, সুমিষ্ট মধু ও পুষ্টিকর পরাগরেণু।

সাদা ফুলেই গন্ধ বেশী কেন ?

বেলা, যুঁই, চামেলি, মল্লিকা, মালতী, রজনীগন্ধা, হাস্নুনা-হানা, নেবু প্রভৃতি গাছের ফুল সাদা এবং মধুর গন্ধে ভরপূর। উহারা সকলেই গ্রীষ্মকালের ফুল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে দিনের বেলা কীট-পতঙ্গ বাহির হইতে পারে না ; সন্ধ্যার পর যখন ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। রাত্রের অন্ধকারে ফুলের অন্য কোন রং দেখা যায় না, কিন্তু সাদা ধব্‌ধবে রং তবুও কিছু দেখা যায়। তাই গাছ বর্ণের বাহারে শক্তির অপচয় না করিয়া—সাদা পাপ্‌ড়িগুলি গন্ধে ভরপূর করিয়া রাখে। গন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া কীট-পতঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে ; গাছেরও কার্য্য সিদ্ধ হয়, কীট-পতঙ্গও তাহাদের খাদ্য পায়।

রঙ্গিন ফুলে সাধারণতঃ গন্ধ থাকে না কেন ?

জবা, শিমুল, গেঁদা প্রভৃতি শীতকালের ফুল—তাহাদের রঙের বাহার কত ? কিন্তু গন্ধ নাই। গন্ধ না থাকিলেও বর্ণ-বৈচিত্র্যে কাহার মন না ভুলে ? গাছ তাহার রঙ্গিন ফুল দিয়াই কীট-পতঙ্গকে ভুলাইয়া আনিয়া কার্য্যসিদ্ধি করে। শীতকালে কেহ রাত্রে বড় একটা বাহির হয় না, কাজেই দিনের বেলা বর্ণের বাহারই নিমন্ত্রণ করিতে যথেষ্ট।

গাছের কি প্রাণ আছে ?

নিশ্চয়ই আছে। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

বন্ধু, যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পে'তে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল-ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।

প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে
অন্ধকার পার করি, আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে

আজ আমরা বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রপাতি দিয়া গাছে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি ; কিন্তু আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ —কমপক্ষে আড়াই হাজার বছর আগে—লিখিয়া গিয়াছেন, **গাছের প্রাণ আছে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদের অত্যন্ত অল্প হইলেও তাহাদের সুখ-দুঃখ বোধের ক্ষমতা আছে।** তোমাদের এ বিষয়ে যদি বেশী জানিতে ইচ্ছা হয় মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পড়িও।

প্রাণের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্তু প্রাণীর লক্ষণ বলিয়া দেওয়া যায়। সে তোমরাও বলিতে পারিবে। মানুষ, গরু, ভেড়া, বাঘ, ভালুক প্রভৃতিকে প্রাণী বলে কেন ? তোমরা বলিবে—উহারা চলাফেরা করে, ছোট থেকে বড় হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য চালায়, খায়-দায়, সন্তানোৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করে ; বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয়ও দেয়। তাই না আমরা রাস্তায় একটা লোক পড়িয়া আছে দেখিলে প্রথমেই দেখি তাহার নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া অসাড় হইয়াছে কি না। উপরে যাহা বলা হইল সেইগুলি প্রাণের লক্ষণ এবং যাহাদের মধ্যে ঐ লক্ষণগুলি দেখা যায় তাহারাই জীব।

গাছে কি আমরা প্রাণের লক্ষণগুলি দেখিতে পাই না ? গাছশিশুকে কি আমরা বীজ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখি না ? তাহাকে কি ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হইতে, ফুল-ফল ধারণ

করিতে, পরিশেষে বীজে সন্তান ধারণ করিয়া বংশ রক্ষা ও বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া মরিতে দেখি না? লতাকে কি আমরা জমির উপর দিয়া কিংবা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া চলিতে দেখি না? লজ্জাবতী সম্বন্ধে কবি কি লেখেন নাই—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওটি লজ্জাবতী লতা
একান্ত সংকোচ-ভরে স'রে আছে একধারে··· ?

শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকা, শিকারকে ভুলাইয়া ফাঁদে 'পা' দেওয়ার নানাপ্রকার কৌশল, ও পতঙ্গকে ভুলাইয়া আনিতে ফুলের পাপড়িতে সৌন্দর্য্যের এত সমাবেশ এত গন্ধ, মধু—সে কি বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক ? বংশ রক্ষা ও, বিস্তারের নানাপ্রকার কৌশল ও ব্যবস্থা কি জড়পদার্থ করিতে পারে ? এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার যন্ত্রপাতি ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন—গাছ প্রাণীর মতই শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য সম্পাদন করে। তাহার শরীরের প্রাণবস্তু—যাহা আশ্রয় করিয়া প্রাণের প্রকাশ—তাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীর একই উপাদানে গঠিত। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্ক নাই, উদ্ভিদেরও নাই, কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর কোন কোন উদ্ভিদে হৃদ্‌যন্ত্র ও নার্ভের অবস্থিতি প্রমাণ করিয়াছেন।

আর একটা কথা তোমরা মনে রাখিবে, অজৈব পদার্থ হইতে জৈব খাদ্য—যাহা সমস্ত জীবজগতের আহার্য্য—প্রস্তুত

করিবার ক্ষমতা একমাত্র সবুজ উদ্ভিদেরই আছে, আর কাহারও নাই ; তাই সমস্ত জীবজগৎ সবুজ উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনধারণের খাদ্যের জন্য নির্ভর করে।

ফলে শাঁস থাকে কেন ?

গাছ অচল জীব। তাহাকে বংশ রক্ষা করিতে হইবে। একটা আমগাছে হাজার ফল ধরা অতি সাধারণ কথা। সেই
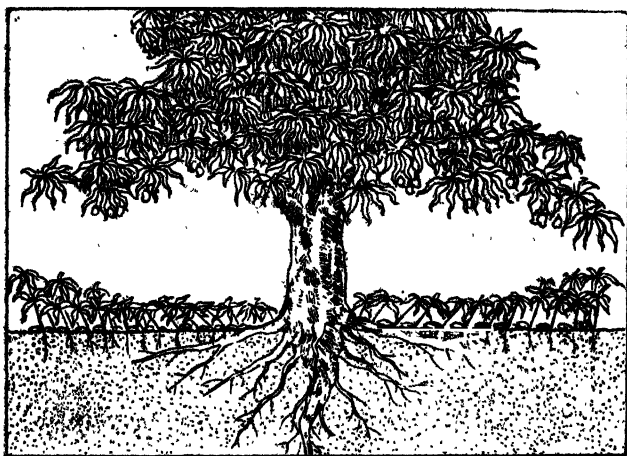
স-সন্তান আমগাছ

আমগাছ ডালপালা মেলিয়া কয়েক বর্গফুট জমির উপর দাঁড়াইয়া থাকে, এই জমিটুকু না হইলে তাহার চলিবে না।

এখন মনে কর হাজারটি আম পাকিল এবং খসিয়া গাছের গোড়ায় সেই কয়েক বর্গফুট জমির মধ্যেই পড়িল। ফলের মধ্যে আছে গাছশিশুর ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায়। অনুকূল অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই কয়েক বর্গফুট জমির উপর হাজার শিশু জাগিয়া উঠিল। ইহাদের প্রত্যেকের জন্যই স্থান, বাতাস, আলো, খাদ্যদ্রব্য ও জল চাই। ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে

কচি আমের বীজ

মারামারি কাটাকাটি হইবেই,—অবিশ্যি অস্ত্রপাতি দিয়া নয়। তোমরা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা কুকুরীর পাঁচটি বাচ্চা হইলে মায়ের দুধ লইয়া মারামারি কামড়াকামড়ি হয়। যে বাচ্চাটি গায়ের জোরে অন্যগুলিকে হটাইয়া দুধ খায়, সে-ই হয় সবল ও সুস্থ এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

গতিতে আসিতে থাকে, তখন বায়ুর সহিত ঘর্ষণে উহা উত্তপ্ত হইতে থাকে। পৃথিবীর যত নিকটবর্ত্তী হয় উহার দেহের উত্তাপও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অবশেষে উহা একটি জ্বলন্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন আমরা উল্কাপিণ্ডকে দেখিতে পাই। পৃথিবীর বুকে পৌঁছিবার আগেই অনেক সময় উহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, কেহ কেহ আবার পৃথিবীতে আসিয়াও পৌঁছায়।

উল্কাপিণ্ড খুব ছোট হইতে খুব বড় আকারের দেখা গিয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার আকাশে এক স্থানে একটি বিরাট

উল্কাপাত

উল্কাপিণ্ড দেখা যায়। উহা যখন ভূমিতে পড়ে, তখন উহাকে বেষ্টন করিয়া ৪০ মাইল দূর পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের বাড়ীঘর পুড়িয়া গিয়াছিল এবং ৪০০ মাইল দূরে রেলের মিস্ত্রিরা তাহার উত্তাপ অনুভব করিয়াছিল।

আরিজোনায় (Arizona) একটি উল্কাপিণ্ডের পতন-জনিত
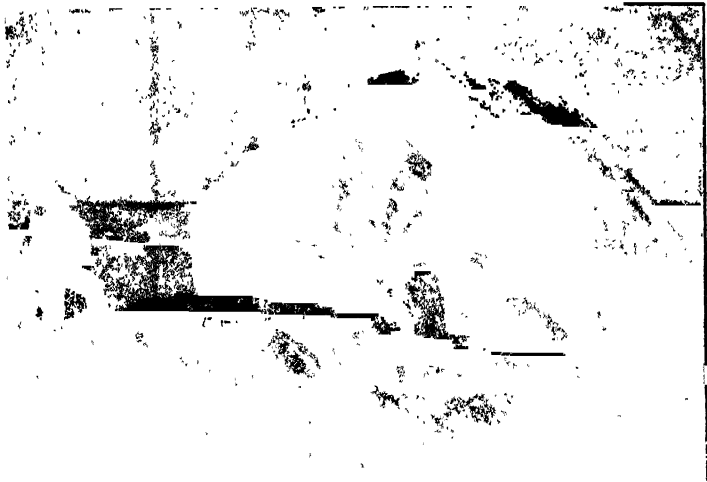
সাইবেরিয়াতে পতিত বৃহৎ উল্কাপিণ্ড

গর্ত্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই গর্ত্তের ব্যাস ১৫০০ গজ এবং খাড়াই প্রায় ৬০০ ফুট। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে উল্কাপিণ্ডটির ব্যাস কমপক্ষে ৩০০ ফুট এবং ওজন দুইশত সত্তর লক্ষ মণ ছিল, এবং তাহার ভিতর ছিল লৌহ, নিকেল, প্ল্যাটিনম,

ইরিডিয়ম এবং ছোট ছোট হীরক—যাহাদের সমবেত মূল্য ধার্য্য হইয়াছে ২৭ কোটি টাকা ! কিন্তু গুপ্তধনের আকর সেই উল্কাপিণ্ডটি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই—যদিও উহার টুকরা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

আমরা ক্ষণে ক্ষণেই চোখের পাতা বন্ধ করি কেন ?

বাতাসে ধূলা-বালির অভাব নাই। সকল সময়ে উহাদের অস্তিত্ব আমরা চাক্ষুস জানিতে না পারিলেও—দরজা বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করাইলে, অন্ধকার ঘরে রৌদ্রের আলোতে উহাদের নাচানাচি আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে।

অক্ষিকোটরে সুরক্ষিত, ভ্রূ ও পাতার রোম থাকা সত্ত্বেও চোখের ভিতর বাতাসের ধূলা-বালি পড়া একেবারে বন্ধ করা যায় না। অথচ চোখের মধ্যে তাহাদের বেশীক্ষণ অবস্থিতি—অনেক সময় চোখে ক্ষত উৎপন্ন করে। তাহারই প্রতিকারের জন্য আমরা বারংবার চোখের পাতা বন্ধ করি।

পাতা বন্ধ করার সময় অশ্রুগ্রন্থি হইতে অশ্রু নিঃসৃত হইয়া সমস্ত চক্ষুটিকে ধুইয়া দেয়; ফলে সমস্ত ধূলা-বালি একত্র হইয়া চোখের কোণে আসিয়া জমা হয় এবং আমরা সেগুলিকে মধ্যে মধ্যে চোখ মুছিয়া বাহির করিয়া দেই।

ঝড় হয় কেন?

বৈশাখ মাসে বিকালবেলা মাঠে খেলা দেখিতে গিয়াছি, কিংবা নদীর ধারে বেড়াইতেছি, কথা নাই বার্ত্তা নাই—হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিয়া ধূলা উড়াইয়া আমাদিগকে বেশ বিপর্য্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল। বৈশাখী সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া মাঝিরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে, কোন কথা নাই—ঈশান কোণে একখানা মেঘ দেখা দিল, দেখিতে দেখিতে সে 'কাল-বৈশাখী' রূপ ধারণ করিয়া নৌকা ডুবাইয়া, বাড়ী-ঘর উড়াইয়া তাহার প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিয়া গেল! জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের পাকা আম খাইবার কতই না আশা করিয়াছিলাম, এক রাত্রের প্রবল ঝড়ে সে আশা নির্মূল হইয়া গেল। এই সর্ব্বনেশে ঝড় হঠাৎ আসে কোথা হইতে?

পৃথিবীকে ঘিরিয়া ঊর্দ্ধে প্রায় দুইশত মাইল ব্যাপিয়া একটি বায়ু-মণ্ডল আছে। এই বায়ু-মণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর প্রায় ৭½ সের। তাহা হইলে আমাদের সমস্ত দেহের উপর বায়ুর কতখানি চাপ আমরা বহন করিতেছি, একবার তাহা ভাবিয়া দেখ।

তাপ পাইলে বায়ু আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন পাতলা হওয়ায় বাতাস উপরের দিকে উঠে—ঠিক যেমন হাল্‌কা সোলা জলের নীচে ছাড়িয়া দিলে উপরে ভাসিয়া উঠে।

আম-শিশুদের অবস্থাও কুকুরের বাচ্চার মতই। তাদের জননী তো আছেনই, তাঁহার পক্ষেই সেই কয়েক বর্গফুট জমি যথেষ্ট নহে তাহার উপর হাজার শিশু! আমাদের দেশের দুঃখিনী ভিখারিণী জননীর পাঁচটি সন্তানের মত অবস্থা নয় কি ?

ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ৯৯৯টি আম-শিশু মরিল, একটি না-মরা হইয়া বাঁচিয়া রহিল। ইহার সন্তান-সন্ততি যদি হয় তবে তাহারা হইবে দুর্ব্বল, শীর্ণকায়। ক্রমে দুই-এক পুরুষের মধ্যেই সেই আমগাছের বংশ লোপ হইল।

কিন্তু প্রাণবন্ত গাছ বংশ লোপ হো'ক চায় কি ? বিশেষ করিয়া যে দেশে পরের ছেলেকে দত্তক পুত্র করিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা আছে! বুদ্ধিমতী আমগাছ করিল কি জান ? ফলের মধ্যে পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিল। তাই না আজ কাশীর নেংড়া আমগাছ তোমাদের বাগানে, মজঃফরপুরের লিচুগাছ সুদূর বাংলার পল্লীগ্রামে! এমন করিয়াই ভাল ভাল তরিতরকারির গাছ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—জন্তু-জানোয়ারের সাহায্যে।

বুকে
সঞ্চিত

বীজে শাঁস কেন ?

বীজের খাদ্য

বীজের মধ্যে গাছশিশু ভ্রূণ-অবস্থায় ঘুমা বীজে সঞ্চিত
মায়ের সঙ্গে তার তখন আর কোন সম্বন্ধই থা
মত অনুকূল অবস্থায় যখন সে ঘুম ভাঙ্গি

জান কি ?

সে কি খাইয়া বড় হইবে ? নিজের খাবার তৈয়ারি করিবার মত দেহের পরিণতি তখনও তো তার হয় নাই। মায়ের বুকে সঞ্চিত দুধের মত বীজেও খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

মটর, ছোলা প্রভৃতি বীজের খোসা ছাড়াইলে মোটা যে দুইটি দাল বাহির হয় উহা ভ্রূণের দুইটি পাতা। এই পাতা

বায়ু-

ধান

পরিমি
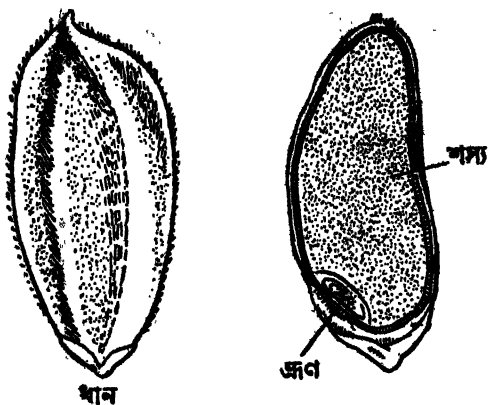
সমস্ত দেহে মধ্যেই খাদ্য সঞ্চিত থাকে, আর সেই জন্যই দাল দুইটি

একবার তাহ, সুতরাং ছোলা মটরের মত বীজে ভ্রূণের শরীরের

তাপ পা জাগিয়া উঠিয়া খাইবার খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

পাতলা হওয়ায় গম, রেড়ি প্রভৃতি বীজের শস্য ভ্রূণের শরীরের

হাল্‌কা সোলা জলের ন।

ধান, গম, যব কিংবা ছোলা, মটর প্রভৃতি বীজের সস্য (শাঁস—সঞ্চিত খাদ্য) পরোক্ষভাবে ইহাদের বংশ-বিস্তারের

রেড়ি

ছোলা

ছোলার ভ্রূণ
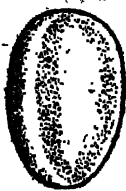
সাহায্য করিলেও প্রত্যক্ষভাবে ইহার উদ্দেশ্য পৃথক্‌। গাছ-শিশু মানবশিশুর মতই ভূমিষ্ঠ হইবার পর সঞ্চিত খাদ্যের উপর তাহার জীবনধারণের জন্য নির্ভর করে। মানবশিশুর জন্য তাহার মায়ের বুকে দুধ সঞ্চিত থাকে, আর গাছশিশুর জন্য বীজে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। যত দিন সে সবুজ পাতা ধারণ করিয়া নিজের খাদ্য নিজে তৈয়ারি করিতে না পারে, ততদিন সে বীজে সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া বড় হয় ও জীবনধারণ করে।

পৃথিবী কি ?

'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা'—

কিন্তু চিরকালই কি আমাদের পৃথিবী এমনই ছিল ? ছিল না। তোমাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করি গ্রহ কি ? তোমরা বলিবে—সূর্য্য হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা তাহার চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং যাহারা সূর্য্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান্—তাহারাই গ্রহ ; যেমন শনি, বুধ, শুক্র প্রভৃতি। এই হিসাবে আমাদের পৃথিবীও সূর্য্যের অন্যতম গ্রহ।

সূর্য্য একটি জ্বলন্ত অগ্নিময় গ্যাসীয় পিণ্ড। আকস্মিক ঘটনার ফলে সূর্য্যের খানিকটা অংশ বাহির হইয়া আসিয়া ভাঙ্গিয়া ক্রমে নয়টি গ্রহে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং পৃথিবী জন্মের সময় ছিল সূর্য্যেরই মত একটি জ্বলন্ত অগ্নিময় গ্যাসীয় পিণ্ড। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, পৃথিবী তাপ হারাইয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিলেন গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় আসিতে পৃথিবীর লাগিয়াছিল পাঁচ হাজার বৎসর। তারপর আরও দশ হাজার বৎসর লাগিল পৃথিবীর উপরিভাগের তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পৌঁছিতে। এই কঠিন স্তরকে বলা হয় **শিলামণ্ডল** (Lithosphere) এবং ইহার গভীরতা ৪০ মাইল। গরম দুধ ক্রমশঃ

ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর যেমন 'সর' পড়ে, ইহার উৎপত্তিও কতকটা সেই রকমেই হইয়াছিল। জলীয় বাষ্প যে তাপ
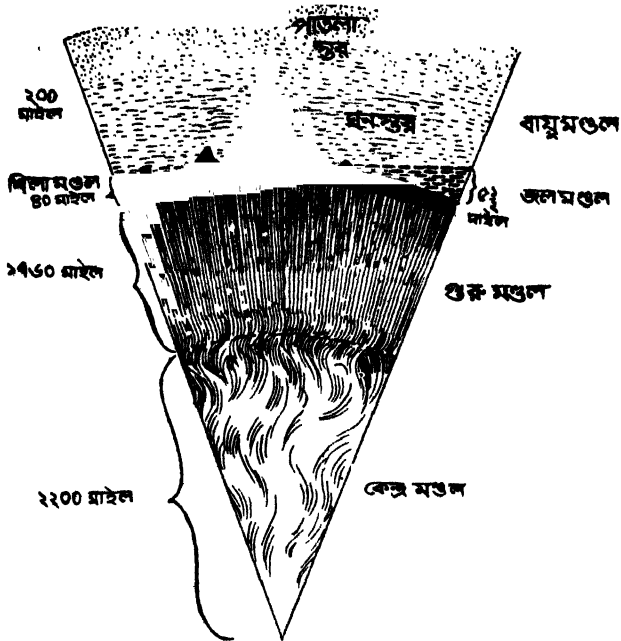
(স্কেল অনুযায়ী আঁকা নহে)

হারাইয়া ক্রমশঃ তরল জলে এবং আরও তাপ হারাইয়া কঠিন বরফে পরিণত হয় তাহা তোমরা সর্ব্বদাই দেখিয়া থাক।

তারপর প্রায় আড়াই-শত কোটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে পৃথিবী যত ঠাণ্ডা হইতে থাকিল উত্তপ্ত তরল পদার্থের ভারী জিনিস নামিল পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে, আর হাল্কা জিনিস উঠিল উপরের দিকে। এই প্রকারে পৃথিবীর কেন্দ্রে ২২০০ শত মাইল ব্যাপিয়া রহিল সর্ব্বাপেক্ষা ভারী নিকেল ও লৌহ তরল অবস্থায়, আর তাহার উপরে শিলামণ্ডল পর্য্যন্ত ১৭৬০ মাইল বিস্তৃত রহিল অক্সাইড ও সাল্ফাইড্। ইহারা তাপ হারাইয়া বর্ত্তমানে পিচের ন্যায় সান্দ্র (viscous) অবস্থায় আছে। শিলামণ্ডলের নীচে ১৭৬০ মাইল-ব্যাপী সান্দ্র স্তরসমূহকে বলা হয় **গুরুমণ্ডল** (Barysphere) এবং তাহার নীচের ২২০০ মাইল কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত তরল স্তরসমূহকে বলা হয় **কেন্দ্রমণ্ডল** (Centrosphere)।

পৃথিবী যখন তাপ হারাইয়া উপরে কঠিন হইতেছিল তখন তাহার উপরে ছিল জলীয় বাষ্প (water vapour)। এই জলীয় বাষ্প ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া জলে পরিণত হইল এবং পৃথিবীর উপরে পতিত হইয়া সৃষ্টি করিল **জলমণ্ডল** (Hydrosphere)। ইতিমধ্যে ভিতরের পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ মোচড় খাইয়া উচুনীচু হইয়াছে। কাজেই পৃথিবীর উপর পতিত জল গড়াইয়া নিম্ন ভূমিতে জমিয়া খাল, বিল, সমুদ্রের সৃষ্টি করিল, আর উচ্চভূমি হইল পাহাড়-পর্ব্বত। কোন কোন স্থলে সমুদ্রের গভীরতা হইল ৫½ কি ৬

মাইল। জলমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের উপরে থাকিল ছুইশত মাইল ঊর্দ্ধব্যাপী বায়ুমণ্ডল (Atmosphere), যাহার চাপ (pressure) পৃথিবীর উপর সমুদ্রের কিনারায় প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর প্রায় ৭½ সের।

সুতরাং আমাদের পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় হইল—উপরে ছুইশত মাইল বিস্তৃত **বায়ুমণ্ডল**, তার নীচে স্থানে স্থানে ৫½ মাইল গভীর **জলমণ্ডল**, জলমণ্ডলের নীচে কিংবা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০ মাইল গভীর কঠিন **শিলামণ্ডল**, তাহার নীচে ১৭৬০ মাইল সান্দ্র অবস্থায় **গুরুমণ্ডল**, আর গুরুমণ্ডলের নীচে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত তরল **কেন্দ্রমণ্ডল**।

মাটি কি ?

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
ধন্য হোক ধন্য হোক হে ভগবান।

কিন্তু বাংলার মাটি তো চিরকাল ছিল না। পৃথিবীর উপরিভাগ তো কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। তবে মাটি আসিল কোথা হইতে এবং মাটি জিনিসটাই বা কি ?

মাটিকে আমরা আমাদের গর্ভধারিণী জননীর সহিত তুলনা করি। মা যেমন সন্তানকে তাঁর বুকের ছুধ খাওয়াইয়া 'মানুষ' করেন, মাটি তেমনই আমাদিগকে দেহ পোষণ ও ধারণ করিবার

চা'ল, দাল, আটা, ময়দা, ফলমূল, তরিতরকারি, মসলা, তেল, চিনি, গুড় প্রভৃতি, পরণের কাপড়, জামার তূলা, শণ, পাট, রান্না করিবার কাঠকয়লা, ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিবার মাটি, কাঠ, বাঁশ, দড়িদড়া ও ছাউনি সরবরাহ করে। এমন কি দুধ, ঘি, মাখন, মাছ-মাংস প্রভৃতি আমরা যাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ

মাটির বিভিন্ন স্তর

করি, তাহারাও মাটিজাত ঘাসপাতা খাইয়া জীবন ধারণ ও পোষণ করে। এমন যে মা ও মাটি তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই না বলা হয়—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

এই মাটি পৃথিবীর জন্মের পনের হাজার বৎসরের মধ্যে ছিল

না। পৃথিবীর শিলামণ্ডলের পরিবর্ত্তনই মাটির উৎপত্তির কারণ।

জল, বাতাস, রৌদ্র, হিম, বৃষ্টি প্রস্তরকে ফাটাইয়া টুকরা টুকরা করিতেছে। 'ঘসিতে ঘসিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়'—কথাটি অতি সত্য, কিন্তু ক্ষয় হইয়া সে লুপ্ত হয় না। পাথরের সেই কণাগুলিই বালুকাকণা। সান-বাঁধান পুরাতন পুকুর-ঘাটে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, জল পড়িয়া পড়িয়া সানের ক্ষয় হইয়াছে।

শিলা-মণ্ডলের উৎপত্তির পর হইতে কিংবা সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপর বৃষ্টি রৌদ্র বাতাসের প্রবল অত্যাচার সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে ধীরে ধীরে পাথর গুঁড়া হইয়া ক্ষয় হইতেছে। বাতাসের ভিজা অক্সিজেন ও কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস্ সর্ব্বদা তাহাদের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা পাথর চূর্ণ হইবার সাহায্য করিতেছে। গাছ-পালা তাহাদের শিকড় পাথরের ফাটলের মধ্যে চালাইয়া বড় বড় পাথরকে ফাটাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে। বড় বড় মন্দির, মস্‌জিদ ও গির্জ্জার গায়ে, পুরাতন অট্টালিকার উপর বট-অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের অত্যাচার তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

গাছের পাতা, ডাল, ফুল-ফল ঝরিয়া পড়িয়া পচিয়া চূর্ণ পাথরের কণার সহিত মিশিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জীবজন্তুর গলিত দেহ, বিষ্ঠা ইহাদের সঙ্গে

মিশিতেছে। এমন করিয়াই কঠিন পাথরের উপর মৃত্তিকার উৎপত্তি হইতেছে।

ঝড়বৃষ্টি ও নদীর স্রোত আবার এই মাটিকে বহন করিয়া দূরে লইয়া যাইতেছে। তাই আমরা বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলা দেখিতে পাই এবং সেই মাটি পলি হিসাবে পড়িয়া আমাদের জমি উর্ব্বরা করিতেছে ; আবার খাল, বিল ও নদীর মোহানা ভরিয়া নূতন নূতন জমির সৃষ্টি করিতেছে।

পাহাড়-পর্ব্বত কি ?

'ভূধর দুরধিগম্য, দূর হ'তে অতি রম্য'—

এমন যে পাহাড়, পৃথিবীর জন্মের সময় কিন্তু সে ছিল না। পৃথিবী যখন গ্যাসীয় অবস্থা হইতে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া তরল অবস্থায় আসিল তখন ভারী অংশ গেল নীচে, আর হাল্কা অংশ উঠিল উপরে। এই অবস্থায় উপরিভাগ আরও তাপ হারাইয়া ৪০ মাইল পরিমিত গভীর স্তর কঠিন হইয়া প্রস্তরে পরিণত হইল। এই স্তরকেই বলে শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল ধীরে ধীরে আরও ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, তাহার ফলে উহা ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকিল। এই সংকোচনের জন্য চারিদিকে মোচড় পড়িল ; কোন স্থান উচু হইয়া উঠিল, কোন স্থান বসিয়া গেল। একটি গোলাকার বড় বেগুন ঝল্‌সাইলে তাহার ছাল যেমন

কোঁচকাইয়া যায়, এ-ও অনেকটা সেইরকমই। নীচু স্থানে আসিয়া জল জমিল—হইল সমুদ্র, আর উঁচু স্থান রহিল জাগিয়া। কোন কোন স্থানে সমুদ্রের গভীরতা হইল প্রায় ৫½ মাইল, আর ডাঙ্গার উচ্চতাও হইল প্রায় তদ্রূপই। এই রকমে পৃথিবীর উপরিভাগ উচু-নীচু জল ও স্থলভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। স্থলভাগের যে সমস্ত স্থান সমতল ভূমি হইতে বেশী উঁচু হইয়া রহিল তাহারাই হইল পাহাড়-পর্ব্বত। অন্য উপায়েও পাহাড়-পর্ব্বত হইয়াছে, কিন্তু ইহাই হইল আদি কারণ।

*

মরুভূমি কি ?

ভারতবর্ষে রাজপুতানায় মরুভূমি আছে ; কিন্তু মরুভূমির কথা ভাবিলেই আফ্রিকা মহাদেশের সাহারার কথা আমাদের মনে পড়ে। সেখানে ধু-ধু করিতেছে বালি ; জল নাই, বৃষ্টি নাই, দিনে প্রচণ্ড গরম, গাছপালার নাম-গন্ধ নাই—

"পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচী বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে',
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দ্দয়।"

জান কি ?

তোমরা পৃথিবীর মানচিত্র আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে—মরুভূমি সাধারণতঃ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত, আর না হয় সমুদ্র ও মরুভূমির মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সবুজ গাছপালার প্রাণ হইতেছে জল ; সেই জল আসে মেঘ হইতে—মেঘ হয় সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হইয়া। বাতাস সেই জলভরা মেঘ বহন করিয়া আনে। সুতরাং সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত যে সব স্থান বাষ্পভরা বাতাস হইতে বঞ্চিত, সেই সমস্ত প্রদেশেই মরুভূমি দেখিতে পাইবে। আবার সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হইয়াও সু-উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা অবরুদ্ধ স্থানেও এই কারণেই মরুভূমি দেখিতে পাইবে। বাতাস সমুদ্রের দিক হইতে না আসিয়া মরুভূমির দিক হইতেই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। দিনে সূর্য্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই বালি যেমন তাড়াতাড়ি গরম হয়, রাত্রে তেমনই শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়। মরুভূমিতে পাহাড়-পর্ব্বত যাহা কিছু থাকে সেগুলি তাড়াতাড়ি গরম ও ঠাণ্ডা হওয়ায় ফাটিয়া চৌচির হইয়া বালিকণায় পরিণত হয় এবং বছরের পর বছর ধরিয়া মরুভূমিতে বালির সংখ্যা বেশী হইয়াই চলে। কিন্তু মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে সাহারার মত মরুভূমিকেও উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কালে সে যে সফলকাম হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।
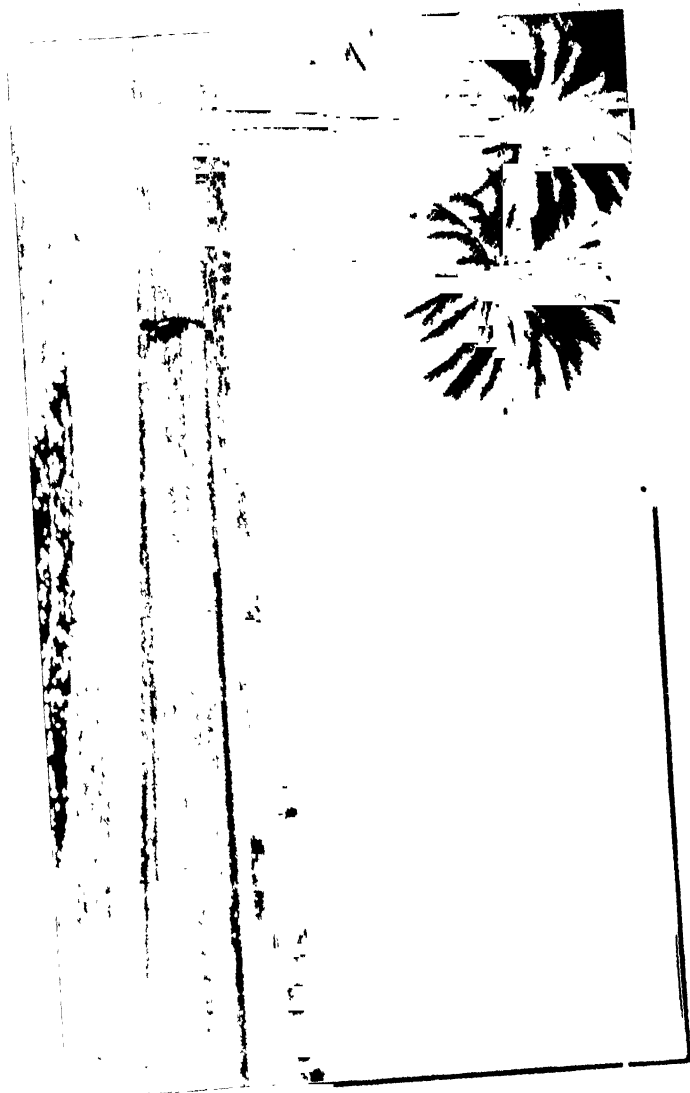
পেট্রোল—কেরোসিন কি ?

কেরোসিন ও পেট্রোলের সহিত আমাদের পরিচয় অনেক প্রকারে। পেট্রোল না হইলে মোটর গাড়ী চলে না, এরোপ্লেন চলে না, সভ্য জগতের অনেক কিছুই হয় না। যে প্রদেশে ইলেকৃট্রিক বাতি নাই সেখানে জোর আলোর প্রয়োজন হইলেই
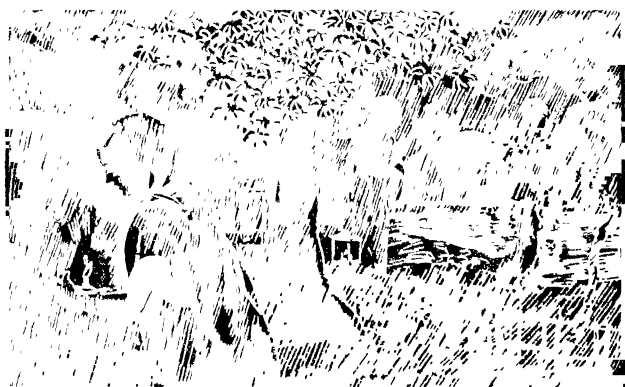
কেরোসিন তৈলের বিভিন্ন রকম বাতি

পেট্রোল ল্যাম্পের ব্যবহার দেখিতে পাইবে। এমন কি মফঃস্বলের অনেক গ্রামে হ্যারিকেন লণ্ঠনের পরিবর্ত্তে পেট্রোল ল্যাম্পের ব্যবহার প্রচলন হইতেছে।

সহরে, বস্তিতে এবং গ্রামে গৃহস্থের ঘরে কেরোসিন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। পেট্রোলের যখন আবিষ্কার হয় নাই,

সস্তা কেরোসিন তৈলই ছিল তখন আলো জ্বালিবার প্রধান উপকরণ। মাটির নীচ হইতে যখন খনিজ তৈল উঠান হয়, তখন তাহারই এক অবস্থাকে কেরোসিন বলে। অপরিষ্কার কেরোসিনকে পরিশ্রুত করিলেই হয় পেট্রোল। মাটির নীচে খনিজ তৈল আসিল কোথা হইতে?

৭০।৮০ বছর আগে খনিজ তৈলের খবর বড় কেহ জানিত

পাইপের সাহায্যে তৈল উত্তোলন

না। তাহার প্রয়োজনীয়তাও মানুষ বড় একটা অনুভব করে নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের ফলে হাজার হাজার ফুট নীচে যখন তাহার সন্ধান মিলিল, তখন মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বড় বড় পাইপ বসাইয়া তাহাকে উপরে উঠান হইল। তারপর

সেই অপরিষ্কার খনিজ তৈলকে ক্রমশঃ রিফাইন করিয়া মোম (petroleum wax), মোটা কলের তৈল, কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল পৃথক্ করা হইল এবং তাহাদিগকে মানুষ তাহার বিভিন্ন কাজে লাগাইল।

কিন্তু মাটির নীচে এই আপাতঃ অফুরন্ত তৈলভাণ্ড কোথা হইতে আসিল ?

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল—যখন উহার বুকে
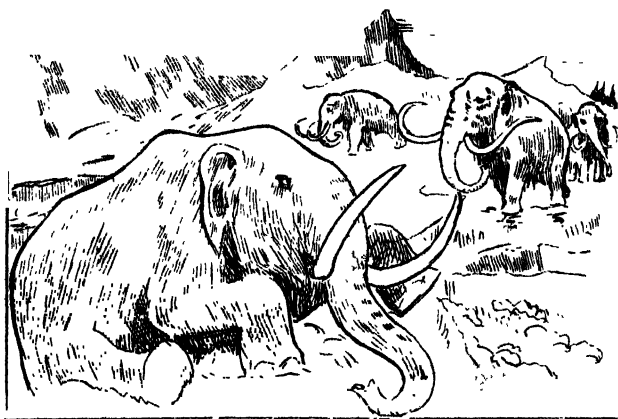
প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণী

নানাস্থান জুড়িয়া মহাবন ছিল। সেই সকল বনে নির্ভয়ে বিচরণ করিত—অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী সকল—যাহাদের কঙ্কালের সহিত আমাদের কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছে।

কালক্রমে ভূগর্ভের সংকোচন কিংবা আকস্মিক ওলটপালটের ফলে সেই সকল ভূখণ্ড বনানী ও জীবজন্তু সহ বসিয়া গেল। তাহার উপর চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য নদ-নদী জল আনিয়া ঢালিয়া, গাছপালা জীবজন্তুকে ডুবাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটি বহিয়া আনিয়া তাহাদিগকে চাপাও দিল। জলের ভিতর মাটি চাপা পড়িয়া তাহাদের সকলেরই দেহ বিকৃত হইল। তাহার ফলে উঁহাদের দেহ হইতে যে সমস্ত বাষ্প বা গ্যাস বাহির হইল তাহা নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ও মাটির চাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া তরল তৈলরূপ ধারণ করিয়া খনিজ তৈলে পরিণত হইল।

কাহারও কাহারও মতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে নানাপ্রকার ধাতুর কার্বাইড আছে। তাহার উপর পৃথিবীর উপরকার জল চুয়াইয়া পড়িয়া খনিজ তৈলের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই তৈল মাটির স্তরের মধ্যে নিবদ্ধ আছে। কূপ খনন করিলে যেমন মাটির নীচ হইতে জল উত্থিত হয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেই সেই স্থান খনন করিলেও তেমনই তৈল উঠিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে আসাম ও পাঞ্জাবের এটক নামক স্থানে এবং বর্ম্মা, রাশিয়া, আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ, পারস্য ও অষ্ট্রিয়ায় তৈলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

কয়লা কি ?

কাঠ পোড়াইয়া যে কয়লা পাওয়া যায় তাহার কথা বলিতেছি না ; রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে গাড়ী বোঝাই করিয়া চালান হইয়া যে পাথুরে কয়লা আসে তাহার কথাই বলিতেছি।

পৃথিবী যখন বয়সে নবীনা তখন তাহার বুকের বেশী

কয়লার খনি

স্থানই অধিকার করিয়া ছিল গাছপালা। অবশ্য একালের সে গাছপালা নয়। কালের প্রবাহে সেই সকল স্থান বসিয়া গেল, নিম্নস্থান উপরে উঠিল। ইহার উপর আসিয়া জমিল

জান কি?

তোমরা বোধ হয় জান না বছরে সারা পৃথিবীতে ছোট-বড় প্রায় ৩০,০০০ হাজার ভূমিকম্প হয়। তাহা হইলে খৃষ্ট জন্মের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কম পক্ষে ৬,০০,০০,০০০ ভূমিকম্প পৃথিবীর বুকে তাহাদের উদ্দামলীলা দেখাইয়াছে।

কথায় বলে কূর্ম্মরূপী ভগবান পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। যখন পীঠের ভার অসহ্য হয় তখন তিনি দেহটাকে
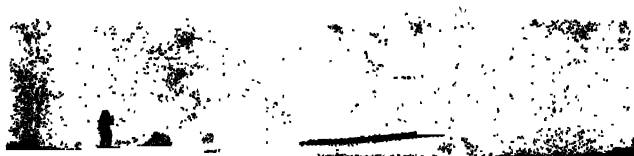
ভূমিকম্পের ফলে রেল-সেতু ভগ্ন

একটু ঝাঁকাইয়া ভার ঠিক করিয়া লন। সেই ঝাঁকুনিতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে—ভূমিকম্প হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি তাহাই?

পৃথিবী গ্যাসীয় অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তাপ হারাইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। উপরের ৪০ মাইল কঠিন স্তরের নীচে

আছে অপেক্ষাকৃত নরম স্তর। এই স্তর তাপ হারাইয়া এখনও সংকুচিত হইতেছে। ইহার ফলে উপরের শক্ত স্তরও সঙ্গে সঙ্গে কোঁচকাইয়া যাইতেছে, ভাঁজ খাইতেছে। এই রকম কুঞ্চিত স্তরের দুই দিকে যদি পার্শ্বচাপ কোন কারণে হঠাৎ বেশী হয় তবে ভাঁজ ফাটিয়া এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা উপরে কিংবা নীচে সরিয়া যায়। ইহাকে চ্যুতি বলে। হঠাৎ এই রকম চ্যুতি ঘটিলেই সেই প্রদেশে ভূমিকম্প হয়। ধনুকের দুই দিক যদি বাঁকাইয়া এক সঙ্গে করিতে চাও তবে ধনুক এক সময় হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ভগ্ন দুই খণ্ড উপর নীচ হইয়া প্রচণ্ডবেগে ছিট্‌কাইয়া যাইবে। পৃথিবীর স্তরের চ্যুতিও এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

এই চ্যুতি কখন হইবে কেহ তাহা বলিতে পারে না ; তাই লোকে সাবধান হইবার সময় পায় না।

ভূমিকম্পের অন্যান্য আরও যে সব কারণ আছে তাহা তোমরা পরে জানিবে।

গাছে কাঁটা কেন ?

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?

কাঁটা আছে বলিয়াই না লজ্জাবতী তৃণভোজী গরু-বাছুর, ভেড়া প্রভৃতির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

গোলাপের কাঁটা আছে বলিয়াই না তোমরা অত সন্তর্পণে গোলাপ তুলিয়া থাক। বেগুনের কাঁটা ফুটিয়া টুনটুনি কি কাণ্ডটাই না বাধাইয়াছিল! কাঁটার সাহায্যেই গাছ আত্মরক্ষা করে।

মরুভূমিতে কিংবা শুষ্কভূমিতে যে সকল গাছ জন্মে তাহাদের শরীরেই কাঁটা বেশী দেখা যায়। আমাদের দেশে কুল, বাবলা, শিয়ালকাঁটা, খেজুর, বেল প্রভৃতি গাছে কাঁটা দেখিতে পাইবে। বাবলা ও খেজুর কাঁটা ফুটিয়া প্রাণান্ত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

বাবলার কাঁটা

গোলাপ কাঁটা

বিছুটী গায়ে লাগিলে জ্বালা করে কেন ?

তোমাদের বিছুটীর সঙ্গে পরিচয় আছে কি ? পূর্ব্বে পাঠশালার ছাত্রদের সঙ্গে ইহার পরিচয় ছিল। পাড়াগাঁয়ে পণ্ডিত মশায়রা দুষ্ট ছেলেকে সায়েস্তা করিতে ইহার সাহায্য লইতেন। বোল্‌তা যেমন হুল ফুটাইয়া শরীরে বিষ ঢালিয়া দেয়—বিছুটীও তেমনি গায়ে হুল ফুটাইয়া শরীরে বিষ ঢালিয়া
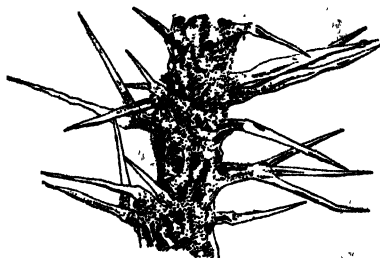
বিছুটীর হুল

দেয় যাহার ফলে সেইখানে ফুলিয়া উঠে ও জ্বালা করে। বিছুটীর হুল ফুটান অনেকটা আজকাল্‌কার ডাক্তারদের ইনজেক্‌সন দেওয়ার মত।

বিছুটীর হুলের গোড়ার দিকটা মোটা ও ফাঁপা, মাথার দিকটা ক্রমশঃ সরু হইয়া একেবারে ছুঁচল, সূচের আগার মতই শক্ত কিন্তু কাচের মত ঠুন্‌কো ; একটু চাপ লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। হুলের ভিতর থাকে এক প্রকার বিষ যাহা শরীরে প্রবেশ করিলেই জ্বালা করে।

বিছুটীর পাতায়, সারা গায়ে অসংখ্য হুল থাকে। গায়ে লাগিলেই উহার শক্ত অথচ ভঙ্গুর আগা নরম চামড়া ভেদ করিয়াই ভাঙ্গিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়া সেইখানে জ্বালা ধরায়।

আমরা হাসি কেন?

হাসি পাইলেই হাসি আর কান্না পাইলেই কাঁদি, কেন? আমাদের মন যখন কোন কারণে প্রফুল্ল হয় তখন সেই মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি হয় হাসিরূপে। হাসি মানসিক অবস্থারই একপ্রকার বিকাশ। আমরা মনের সেই অবস্থা কখনও হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করি, আর না হয় সমস্ত শরীরের স্পন্দনে তাহা প্রকাশিত হয়।

শিশুরা কাঁদে কেন?

ছোট ছোট শিশু যাহারা কথা বলিতে পারে না, অসুবিধা হইলেই তাহারা কাঁদিয়া তাহাদের মা কিংবা অন্য কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে। মনে কর, খোকা বা খুকুর ক্ষুধা পাইয়াছে আর না হয় পেট ব্যথা করিতেছে, সে তাহা জানাইবে কেমন করিয়া? কথা তো বলিতে পারে না। তাই সে কাঁদিয়া তাহার অভাব-অভিযোগ জানায়।

আমরা শব্দ শুনি কেন ?

শব্দ যাহারা শুনিতে পায় না তাহাদের বলা হয় 'কালা'। আমরা শুনিতে পাই, আর তাহারা শুনিতে পায় না কেন ?

আমরা কান দিয়া শুনি। কানের তিনটি ভাগ, যথা— বাহিরের অংশ (outer ear) যাহা আমরা দেখিতে পাই, ইহার
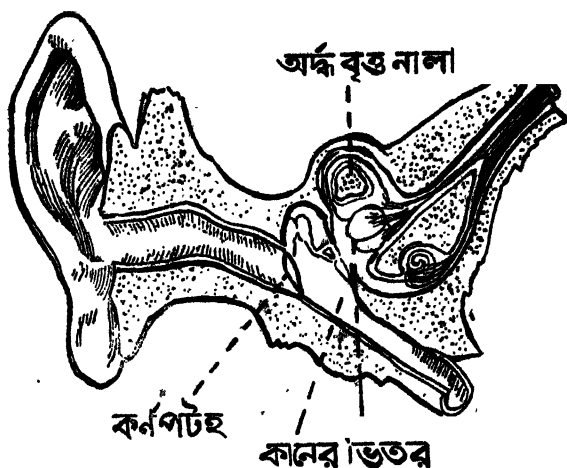
শেষে আছে একটি পাতলা পর্দ্দা ; তার পরের অংশকে বলে মধ্য-কান (middle ear), ইহার মধ্যে আছে তিনখানি অস্থি।

ইহাদের একখানি পর্দ্দার সহিত যুক্ত, এবং তৃতীয়খানি ভিতরের কানের (inner ear) কক্‌লিয়া নালির (cochlea canal) মুখ বন্ধ করিয়া অবস্থিত। কক্‌লিয়ার ভিতর আছে তরল পদার্থ, আর এই তরল পদার্থের উপর শব্দ বহনকারী নার্ভগুলির এক প্রান্ত ভাসিয়া থাকে।

তোমার নাম ধরিয়া যেই আমি ডাকিলাম অমনই বাতাসে ঢেউ উঠিল। সেই ঢেউ কানের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া পর্দ্দাকে কাঁপাইল। পর্দ্দার কম্পন অস্থিগুলিকে ধাক্কা মারিয়া কক্‌লিয়ার মধ্যস্থিত তরল পদার্থে ঢেউ উঠাইল। সেই ঢেউ নার্ভগুলিকে উত্তেজিত করিল, তখন এই নার্ভগুলি দিয়া শব্দের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছাইলে আমরা শব্দ শুনিতে পাইলাম।

কানের ছিদ্র বন্ধ করিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই না, তাহার কারণ বাতাসের শব্দ-তরঙ্গ কানে প্রবেশ করিয়া পর্দ্দা কাঁপাইতে পারে না। তাই না কথা হইয়াছে—

বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তূলো,
মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।

যাহারা কানে শুনিতে পায় না, তাহাদের কানের পর্দ্দা নষ্ট হইয়া যায়।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

মোটর গাড়ী—কত অল্প সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া সম্ভব হইয়াছে।
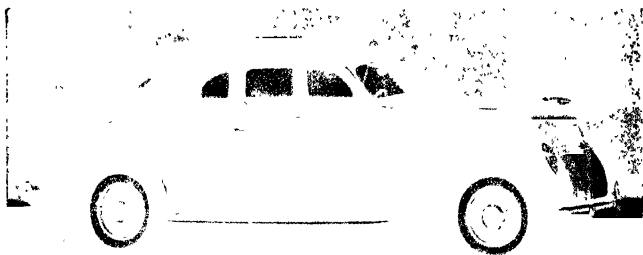
মোটর গাড়ী

টেলিগ্রাফ—কত কম সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের খবরাখবর লওয়া সম্ভব হইয়াছে।

রেডিও—বেতার বার্ত্তার প্রভাবে আজ ঘরে বসিয়া আমরা সারা পৃথিবীর খবর পাইতেছি, সন্ধ্যার পর গান শুনিতেছি, সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজ সাহায্যের জন্য খবর পাঠাইতেছে, সুমেরুর বরফের মধ্যে বসিয়া আবিষ্কারক সংবাদ পাঠাইতেছেন, আরও কত কি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি—এক জায়গায় বসিয়া সুইচ টিপিয়া সমস্ত বাড়ী আলোকমালায় উদ্ভাসিত করা সম্ভব হইয়াছে।

টেলিফোন—আজ কলিকাতা বসিয়া বোম্বাই কিংবা সুদূর

টেলিফোনে কথা বলা হইতেছে

লণ্ডনস্থ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলা ইহার কল্যাণেই আজ সম্ভব হইয়াছে।

উড়ো জাহাজ—আজ যে ৪ দিনে ৬০০০ হাজার মাইল
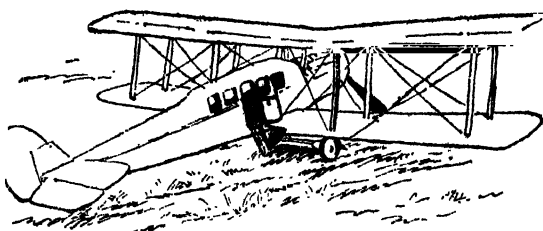
এরোপ্লেন

দূর লণ্ডনের চিঠি কলিকাতা পোঁছিতেছে তাহা ইহার জন্যই

সেফ্‌টি ক্ষুর—এক মুখ দাঁড়ি লইয়া ভদ্র সমাজে বাহির হইবার রীতি চলিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর ঝাঁকুনির মধ্যে, মোটরে দূরের পথে পাড়ি জমাইতে জমাইতে নিশ্চিন্তে অক্ষত ভাবে ক্ষৌরাদি কার্য্য সমাধা করিয়া সভ্য সমাজে চলাফেরা করা সম্ভব হইয়াছে।

সিনেমা, বায়স্কোপ—পূর্ব্বে থিয়েটার দেখিয়া লোকে আমোদ পাইত, কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা দেখা সুবিধা ও সুযোগ সাপেক্ষ ছিল না। তা' ছাড়া অন্য দেশের ভাল ভাল থিয়েটার দেখিবার কিংবা গান শুনিবার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা ছিল? মেরি পিক্‌ফোর্ড, লরেল হার্ডি, গ্যারি কুপার, গ্রেটা গার্ব্বো, চার্লি চ্যাপ্‌লিন, রোম্যান নেভারো—এই যে সব পৃথিবী-বিখ্যাত অভিনেত্রী ও অভিনেতা যাহাদের নাম আজকালকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও মুখে মুখে, তাহাদের অভিনয় দেখিবার সুযোগ 'সবাক' সিনেমার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে।

রেলগাড়ী—আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ঘুমাইলে, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলে প্রায় ৪৫০ মাইল পাড়ি জমাইয়া কাশী পৌঁছিয়াছ—যে কাশী তোমার আমার ঠাকুরদা'রা নৌকায় করিয়া তিন মাসে পৌঁছিতেন!

ফনোগ্রাফ, গ্রামোফোন—গান নাকি স্বর্গীয় জিনিস,

গ্রামোফোন

ফনোগ্রাফ

ভাল গায়কের গান শুনিবার সামর্থ্য বা সুযোগ তো বেশীর

ভাগ লোকেরই হয় না। এই দুঃখ দূর করিয়াছে ফনোগ্রাফ ও তাহার পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত সংস্করণ গ্রামোফোন ও রেকর্ড। আজ যাঁহারই কিছু পয়সা আছে তিনিই একটা গ্রামোফোন ও কতকগুলি বাছা বাছা রেকর্ড কিনিয়া নিজে ও দশজনকে গান, বক্তৃতা প্রভৃতি শুনাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছেন।

সেলাই-এর কল—ইহারই কল্যাণে আজ আমাদের মেয়েরা সুনিপুণ দর্জ্জি হইবার সুযোগ পাইয়াছে ; এবং ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় তৈয়ারির খরচ কমাইয়া সুগৃহিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

ঝরণা কলম (Fountain pen)—ইহার দৌলতে চিঠি-পত্র লেখা, ক্লাশে নোট লওয়া প্রভৃতি কত সুবিধা হইয়াছে তাহা তো তোমরা জানই।

ছাপিবার যন্ত্র—মহাভারতখানি হাতে লিখিতে কত দিন লাগিয়াছিল মনে ভাব দেখি ? আর আজ হাজার হাজার কপি অত বড় মহাভারত ছাপিতে কত দিন লাগে ?

ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম—৪০ বছর আগে যাঁহারা কলিকাতা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন ঘোড়া টানা ট্রামে কালীঘাট হইতে শ্যামবাজার পৌঁছিতে কত সময় লাগিত। সময়ের কথা

ছাড়িয়া দিলেও পথে চলিতে চলিতে পক্ষিরাজ ঘোড়া যদি একবার রাস্তায় শুইয়া পড়িলেন তবে সেদিন শ্যামবাজার পৌঁছিবার আশাই রহিল না। আর আজ ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রামে নিরাপদে আরাম করিয়া গদী-আঁটা সিটে বসিয়া মাথার উপর পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে বালীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে কালীঘাট,

ট্রাম গাড়ী

এস্‌প্লানেড, ডালহাউসি স্কোয়ার ঘুরিয়াও পৌনে এক ঘণ্টায় শ্যামবাজার পৌঁছা সম্ভবপর হইয়াছে।

টাইপ রাইটার—আগে ভাল ও পরিষ্কার হাতের লেখা একটি গুণের মধ্যে গণ্য হইত। তা' ছাড়া চেষ্টা করিয়া বেশী তাড়াতাড়ি লিখিবার উপায় ছিল না। আজকাল হাতের লেখা, এক পরীক্ষার্থী ভিন্ন অন্য কাহারও না হইলেও চলে; কেননা, টাইপ রাইটারে অতি পরিষ্কার ও তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব হইয়াছে।

বাষ্পীয় পোত—জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতির সুবিধা নৌকা কিংবা পালের জাহাজের চাইতে কত বেশী তাহা তোমরা

ষ্টীমার

পূজা কিংবা অন্য ছুটীতে বাড়ী যাইবার সময়ই বুঝিতে পার। ঝড়-বাতাস, দিন-রাত্রি জাহাজের কাছে সবই সমান।

ঘড়ি—Time is money যেখানে, সেখানে সময়ের মূল্য

ঘড়ি

কত তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ঘড়ি না থাকিলে অতি সহজে সময় নিরূপণ করিতে কি প্রকারে ?

ক্যামেরা—প্রিয়জনের প্রতিকৃতি রাখিতে ক্যামেরার কত দরকার তাহা তোমরা জান। বিলাতে ক্রিকেট খেলা হইতেছে, কলিকাতার মাঠে ফুটবল খেলা হইতেছে—এসব ছবি
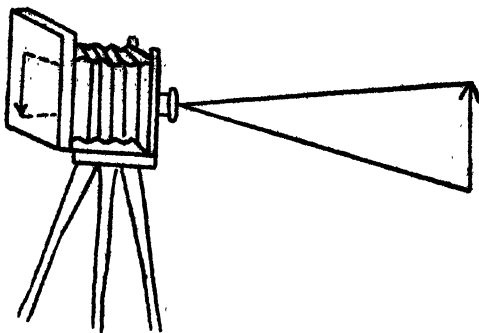
ক্যামেরা

খবরের কাগজে যে দেখিতে পাও সে ক্যামেরা আবিষ্কারের জন্যই।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্পূর্ণ লিষ্ট দেওয়া এখানে অসম্ভব ; তাই এই কয়টির কথা বলিয়াই গ্রন্থ বর্ত্তমানে শেষ করিলাম।